প্রবাসে প্রাকৃতজন

– সারথী হাসান

গত বছর মার্চে যখন তিন বছরের ছেলেকে নিয়ে সুইডেন আসি তখনো বুঝতে পারিনি কি ফেলে আসছি। বৃদ্ধা মায়ের আকুতিতে সান্ত্বনা দিয়েছি পিএইচডি মাত্র চার বছর আর প্রতি বছর তোমাকে দেখতে আসবো।

সাত দিন পরে আমার ইন্টারভিউ। সুইডেনের প্রথম সারির মেডিকাল ইউনিভার্সিটি Karolinska Institute বা সংক্ষেপে K.I–তে। এ দেশে পিএইচডি অ্যাডমিশন পুরোটাই নির্ভর করে প্রফেসরের সিদ্ধান্তের ওপর। তার যদি ফান্ড থাকে এবং তিনি যদি মনে করেন তার প্রজেক্ট–এর জন্য স্টুডেন্ট উপযুক্ত তাহলে মোটামুটি নিশ্চিত।

আমার সুপারভাইজার একজন আমেরিকান মহিলা। প্রচণ্ড কর্মঠ, স্পষ্টবাদী, উচ্চাভিলাষী এবং মিশুকও। একই সঙ্গে প্রফেসর, মা, স্ত্রী নানান সংগঠনের সঙ্গেও জড়িত।

প্রথমদিন জিজ্ঞাসা করলেন, Why Karolinska?

জবাবে বললাম, প্রথমত আমার স্বামী এখানে আছে, এখানে কোনো টিউশন ফি নেই। তাছাড়া ছোটবেলা থেকে নাম শুনেছি এখানে নোবেল পুরস্কার দেয়। তাই কিছুটা ভালোলাগার ব্যাপারও আছে।

জবাব শুনে মনে হলো খুশি হলেন। তারপর নানান একাডেমিক প্রশ্নের পর বললেন, দুই মাস আমার এখানে কাজ করো। যদি দুজনেরই ভালো লাগে তাহলে রেজিস্ট্রেশন (ভর্তি) করাবো এবং স্টাইপেন্ড দেয়া শুরু করবো।

কিছুটা টেনশন থাকলেও রিস্ক না নিয়ে উপায় নেই। অন্তত একজনকে টাকা পেতে হবে (আমার স্বামী তখনো টাকা পায় না)। না হলে নিজের টাকায় সংসার চালানো অসম্ভব। নতুন জায়গা, নতুন কাজ, কি হবে ইত্যাদি ভাবনায় মনেই পড়েনি মাস খানেক দেশের কথা, সবার কথা।

এক মাস পরেই প্রফেসর বললেন, আমি খুশি, তোমাকে আমার স্টুডেন্ট হিসেবে রেজিস্ট্রেশন করাচ্ছি। আগামী মাস থেকে টাকাও পাবে।

খুশি হলাম, টেনশনমুক্ত। কিছুদিন পরে মহীও টাকা পাওয়া শুরু করলো। সব কিছু নিশ্চিত। আর তখনি একটু একটু করে মন খারাপ শুরু হলো। অতি ভদ্র, বিনয়ী সুইডিশদেরকে মনে হতে লাগলো অহংকারী, নাক উচু।

ঝকঝকে রাস্তায় বিলাসী ভলভো বাসে চড়েও মনটা খচ খচ করে গৃণ রোডের সেই ভয়াবহ নট নড়ন চড়ন জ্যামের জন্য। সুদর্শন বাস ড্রাইভার দেখে মনে পড়ে প্রিয় রিকশাচালক ভাইদের কথা, তাদের কমন ডায়ালগ *সিংগল দিছি না মাংগির পুত?*

ম্যাকডোনালডস–এ খেতে বসে মিস করি কোহিনূর–এর সিংগাড়া কিংবা শাহবাগ মোড়ের চা। কতো কি, কতো কিছু যে প্রতি মুহূর্তে মনে পড়ে তার ইয়ত্তা নেই।

মাঝে মধ্যে যখন এদের কাছ থেকে কোনো সযত্ন, অবহেলা বা উপেক্ষার ভাব বুঝতে পারি তখন খুব, খুবই মনটা বিষণ্ন হয়ে যায়। মনে হয় এক ছুটে চলে যাই মায়ের কোলে, নিকুচি করি পিএইচডি–র। আবার যখন বাস্তবে ফিরি তখন মনে হয়, না, কি হবে ফিরে, আমাদের শরীর কোনো দলের লেবেল নেই। নেই কোনো উত্তরাধিকারের ছাপ। আমাদের পূর্ব পুরুষেরা কেউ বাঘের পিঠে চড়ে বাংলাদেশে আসেননি কিংবা কেউ রেখে যায়নি কোনো ভাঙা বৃফকেস। আমরা বাংলাদেশের অগণিত ছাপোষা, ভুক্তভোগী মানুষের একজন। তারচেয়ে এই ভালো, নির্ঝঞ্ঝাট, নিশ্চিত জীবন, পড়ালেখা শেষ করে এখানেই কোথাও কাজ করা, প্রবাসে প্রাকৃতজন হয়ে বেচে থাকা।

সুইডেনে বিভিন্ন শ্রেণীর পেশার প্রায় ছয় সাত হাজার বাঙালি আছেন যাদের দুই একজনকে চিনি। যারা বহুদিন ধরে আছেন তারা স্বভাবতই দেশের ব্যাপারে বীতশ্রদ্ধ। ওনারা যখন নানান কথা বলেন তখন চুপ করে থাকি। মাঝে মধ্যে জিজ্ঞাসা করি, আপনি – আমি কেউ তো আমাদের দায়িত্ব পালন করিনি। অভাবী, নিরন্ন জনগণের ট্যাক্স–এর পয়সায় ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে শুধু নিজের ক্যারিয়ার এবং ভবিষ্যতের কথা ভেবে পাড়ি দিয়েছি আকাশে, ভুলে গিয়েছি জন্মদাত্রীকে। পালক মা সুশ্রী, পয়সাওয়ালা বলে ভুলে যাবো ভিখারিনী জন্মদাত্রীকে?

তারা আমার প্রশ্নের কোনো জবাব দেন না। বিষণ্ন মুখে উল্টো প্রশ্ন করেন, হ্যা, আমরা কিছু দিইনি। কিন্তু কি দিয়েছে দেশ আমাকে এই বত্রিশ বছরে শুধু ভৌগোলিক পরিচয় ছাড়া? এটা কি বড় নয়? কি করবো দেশে ফিরে? দুই পক্ষের রাজনৈতিক চুলোচুলির সাক্ষী হতে? ছিনতাইকারীর হাতে প্রাণ দিতে? বুড়িগঙ্গায় ভাসমান সন্তানের লাশ দেখতে?

এর উত্তর দিতে পারি না। এর উত্তর আমার জানা নেই। উত্তর নেই বলেই মনে হয়, *সব পাখি ঘরে ফেরে, ফেরে না শুধু প্রবাসী বাঙালিরা।*

এসব ছোটখাটো পাওয়া, না পাওয়া মিলিয়ে দিন কেটে যায়। দেশের জন্য মন কাদে, হতাশ হই আবার ছোট্ট কোনো ঘটনায় উদ্দীপিত হই। এখানকার এক ডাক্তার দম্পতির দুই মেয়ে আছে, পরীর মতো সুন্দর। তাদের জন্ম এখানে। তারা যখন পরিষ্কার বাংলায় গুছিয়ে কথা বলে এখানকার কোনো আনাড়ি গায়কের গাওয়া বাংলা গান শোনে তন্ময় হয়ে তখন আশান্বিত হই, না, আমাদের হারানোর কিছু নেই। যে সংস্কৃতি আর ঐতিহ্য আমাদের রক্তে তা বাহিত হবে প্রজন্মে থেকে প্রজন্মে, হাজার মাইলের ব্যবধানে কিছু যায় আসে না।

গত সপ্তাহে তুমুল বরফ পড়েছে এখানে। বাড়ি–ঘর, রাস্তা–ঘাট, গাছ–পালা সব ধবধবে শাদা। এর ওপর যখন নরম রোদের আলো ঝিকমিক করে তখন খুব সুন্দর লাগে। কিন্তু তা যতোই সুন্দর হোক, আমাদের ফাগুনের কাছে কিছুই নয়। শিমুল, পলাশ, জারুল কিংবা আগুন রঙা আশোকের ফাগুনের সঙ্গে কি তুলনা হয় এই কনকনে শীত, ঝিরঝিরে তুষার আর মেঘলা আকাশের? *ইনহাস্ত ওয়াতানাম। বাংলাদেশ ইয়ো সকনা দিই* (বাংলাদেশ I miss you)।

স্টকহোম, সুইডেন থেকে

শাদা আর কালো

– দেলওয়ার হোসাইন

দুই ছেলে আর এক মেয়ে থাকে নিউ ইয়র্কে। ১৯৯৯ সালের পর আমার ও ১৯৯৭ সালের পর গিন্নির নিউ ইয়র্ক যাওয়া হয়নি নানান রকম অনিবার্য কারণে। ইতিমধ্যে ছেলে বড়টির ছেলে হয়েছে, ছোটটির এক মেয়ে ও এক ছেলে এবং মেয়ের এক ছেলে ও এক মেয়ে।

মোট পাচ নাতি–নাতনিকে দেখা হয়নি জন্মের পর থেকে। যাবো যাবো করছি। এর মধ্যে মাথায় বজ্রাঘাতের মতো টুইন টাওয়ার ভাঙায় ঘটনা ঘটে গেল। আমেরিকানরা কেমন ক্ষেপে যায়, ভিসার ব্যাপারে কি কড়াকড়ি হয় দেখতে দেখতে কেটে গেল এক বছর। যাই হোক। ভিসা পাওয়া গেল ২০০২ সালের এপৃল মাসে। তৈরি হতে হতে এসে গেল জুন মাস। নিজেদের ও আত্মীয়স্বজনের দেয়া জিনিসপত্রে লাগেজ হলো ছয়টি। রওনা হওয়ার মাস খানেক আগ থেকেই রটনা রটলো, মুসলমানদের এক মাসের বেশি এন্ট্ ভিসা দেয় না আমেরিকা। দুজনের টিকেট খরচেই লাখ দেড়েক টাকা খরচ হলেও রওনা হলাম এই ভরসায় যে, নাতি–নাতনিদের তো দেখা যাবে।

এমিরেটস এয়ারলাইন্সের টিকেট কাটা হয়েছিল। ২০ জুন রাত নয়টায় ঢাকা থেকে প্লেন ছেড়ে দুবাই পৌছালাম রাত এগারোটার দিকে। এয়ারলাইন্সের রাজকীয় হোটেল পেলাম দুবাইতে, সঙ্গে রাতের হালকা খাবার। ঘণ্টা ছয়েক থাকা হলো রাজকীয় হোটেলে। ভোর সাতটার দিকে আবার যাত্রা। হিথরো হয়ে জেএফকে। একই দিন বিকাল আটটার দিকে নামলাম নিউ ইয়র্কের জেএফকে এয়ারপোর্টে। বুক দুর দুর করছিল। কি জানি কি প্রশ্ন করে ইমিগ্রেশন কাউন্টারে।

কিন্তু শুধু জিজ্ঞাসা করলো, কে কে থাকে আমেরিকায়।

বললাম, গোটা পাচ ছয় শ্যালক, চার পাচ শ্যালিকা, ছেলেমেয়ে ও দূরসম্পর্কের আত্মীয় এবং বন্ধু–বান্ধব। এদের সবার সঙ্গে দেখা করতে হবে। মহিলা ব্ল্যাক–আমেরিকান ইমিগ্রেশন অফিসার আমাদের আমেরিকা ভ্রমণ আনন্দদায়ক হোক বলে পাসপোর্টে সিল মেরে দিল। দুই মিনিটও লাগেনি ইমিগ্রেশন অতিক্রম করতে। পাসপোর্ট সামলাতে সামলাতে দেখলাম ছয় মাসের এন্ট্ ভিসার সিল মারা হয়েছে। হাপ ছেড়ে বাচলাম।

এয়ারপোর্টের ছয় নাম্বার গেটে দাড়িয়ে অপেক্ষা করছি ছেলেদের ও জামাই বাবাজির। তাদের না দেখে গিন্নির জিম্মায় ছয়টি বিশালকায় সুটকেস রেখে টেলিফোন করলাম মেয়ের বাসায়। মেয়ে জানালো এতোক্ষণে তাদের এয়ারপোর্টে পৌছে যাওয়ার কথা। ফিরে এলাম গিন্নির কাছে। দশ মিনিটের মধ্যেই ছেলেরা, জামাই বাবাজি এবং তাদের বন্ধু বহর এসে হাজির। কৈফিয়ত দিল পার্কিং পেতে দেরি হওয়ার।

কুশল বিনিময়ের পর ছেলেদের বাসায় এসে পৌছালাম। নাতি–নাতনিরা অবাক হয়ে দেখছে আমাদের দুই বুড়ো–বুড়িকে। অবশ্য তাদের দাদিকে বা নানিকে বুড়ি বলা যাবে না। প্রকৃত বয়স তার পঞ্চাশের কাছাকাছি হলেও সে বয়স লুকাতে জানে। কোনো অনুষ্ঠান উপলক্ষে মেকআপসহ কাপড় পরলে তাকে ত্রিশ বলে অনায়াসে চালিয়ে দেয়া যায়। এবার ছেলেদের ও মেয়ের সংসার গোছানো

পেলাম। সবারই গাড়ি হয়েছে। বড় ছেলে বাড়ি কিনেছে। তাই ওই রাতেই অনেক প্ল্যান–প্রোগ্রাম করা হলো কে কোনদিন কোথায় নিয়ে যাবে।

পরদিন উইকএন্ড। আমাদের আগমন উপলক্ষে ভালো বাজার করা হবে। ভোরবেলা ছোট ছেলে ও মেয়ের জামাইয়ের সঙ্গে গেলাম নিকটস্থ এক পাইকারি বাজারে। এস্টোরিয়ার নামকরা সুপারমার্কেট *কসকো।* সদস্য ছাড়া সবাই ঢুকতে পারে না ওই বাজারে। জিনিসপত্রের দাম অর্ধেকেরও কম।

বাজার করে ফেরার পথে ঘটলো এক দুর্ঘটনা। একুশ নাম্বার স্ট্রট থেকে ছত্রিশ এভিনিউতে ঢুকেছি মাত্র। পাশের এক গ্রসারি থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এলো এক কৃষ্ণকলি। বয়স তেরো চোদ্দ হবে। সে রাস্তা ক্রস করার জন্য দৌড় দিতেই ধাক্কা খেলো ছেলের গাড়িতে। তার হাতের জিনিসপত্র ছিটকে পড়ে গেল গাড়ির ডানদিকের লুকিং গ্লাসে ধাক্কা লেগে। ছেলে গাড়ি ব্রেক করতেই ভীষণ শব্দ হলো। অপর পার থেকে মেয়ের মা যে একটু আগেই রাস্তা ক্রস করেছে, চিৎকার দিতে দিতে মেয়েকে ধরে নিয়ে গেল রাস্তার অপর পারে। ওই পারে নিগ্রো কলোনি। মুহূর্তে কয়েকশ কালো মানুষ জমে গেল।

আমরা গাড়ি থামিয়ে ব্যাপার বোঝার চেষ্টা করছি। ধাক্কা খাওয়ার পাশেই দাড়ানো ছিল এক মধ্যবয়সী নিগ্রো ভদ্রলোক। সে এগিয়ে এলো আমাদের দিকে। ভরসা দিল আমাদের কোনো দোষ নেই, মেয়েটিই এর জন্য দায়ী। পাচ মিনিটের মধ্যেই এসে গেল অ্যাম্বুলেন্স ও পুলিশের গাড়ি। পুলিশ এসে মেয়েটিকে দেখলো এবং জনতার ভাষ্য শুনলো। তারপর মেয়েটিকে অ্যাম্বুলেন্সে উঠিয়ে দিয়ে পুলিশ এলো ছেলের গাড়ির কাছে। তার কাগজপত্র চেয়ে নিল। গাড়ির পজিশন ও ধাক্কা লাগার জায়গা পরীক্ষা করে কলম দিয়ে রাস্তার ম্যাপ একে সব লিখে নিল। কোনো হই চই, ধমক–ধামক নেই যেন কিছুই হয়নি।

ছেলে ও মেয়ের জামাই তাদের বক্তব্য পেশ করলো। এতে প্রায় আধঘণ্টার মতো সময় লেগে গেল। এই আধঘণ্টা ধরে ওই মধ্যবয়সী নিগ্রো দাড়িয়ে থাকলো পুলিশকে তার বক্তব্য দেয়ার জন্য যেটা পুলিশ সবার শেষে নিয়ে থাকে।

প্রত্যক্ষ সাক্ষী হিসেবে সে যা বক্তব্য দিল তা সম্পূর্ণ মেয়েটির বিপক্ষে গেল। বললো আমাদের কিছু মাত্র দোষ ছিল না, সম্পূর্ণ দোষ মেয়েটির। সে পেছনে গাড়ি আসছে কি না তা না দেখে রাস্তা অতিক্রম করতে চেয়েছিল।

পুলিশ তাদের রুটিন মোতাবেক ঘটনার বিবরণ দিয়ে আমাদের বললো, তোমরা যেতে পারো।

নিগ্রো ভদ্রলোককে আমরা ধন্যবাদ জানালাম এতোক্ষণ অপেক্ষা করে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য।

সে বললো, মেনশন নট। এটা আমার কর্তব্য। তোমরা বিনা অপরাধে শাস্তি পাবে সেটা হতে দেয়া যায় না।

কালো মানুষটির প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে এলো। বাইরে সে কালো, অথচ ভেতরটা কতো শাদা!

মানিকনগর, ঢাকা থেকে

কষ্ট

– জাফর আহমদ আকাশ

আমার চাচাতো ভাই হারুন। তার কথাই বলবো। হারুন ছেলে হিসেবে খুব সাহসী, কর্মঠ এবং উচ্চাভিলাষী ছিল। এসএসসি পাস করার পর হারুন ইটালি যাওয়ার জন্য চাচা চাচিকে বলতে লাগলো। অনেক টাকার ব্যাপার। তাই চাচা প্রথমে তেমন সাড়া দিলেন না। কিন্তু ছেলের জেদের কাছে চাচাকে হার মানতে হলো। চাচা তিন লাখ টাকায় আদম ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কন্ট্রাক্ট করলো।

এরপরের কথাগুলো হারুনের মুখে শোনা হারুন আমাকে তার অভিজ্ঞতার কথা বলে চলেছে – আমরা কয়েকজন বিমানে চড়লাম। সঙ্গে আদম ব্যাপারীদের লোক ছিল। বিমান মাঝপথে বিরতি দিয়ে আবার ছুটে চললো রাশিয়ার উদ্দেশ্যে। রাশিয়া পৌছানোর পর দালাল আমাদেরকে এক হোটেলে উঠালো। সেখানে আমাদের মতো আরো কয়েকজনকে দেখতে পেলাম। তারাও ইটালি যাবে।

দুইদিন পর আমাকে এবং আরো দুইজনকে প্রাইভেট কারের পেছনে বনেটের ভেতরে ভরে কোথায় নিয়ে গেল বুঝতে পারলাম না। যখন বের হলাম দেখি এক জঙ্গল। দালাল জানালো, সবাইকে এই জঙ্গল পার হতে হবে।

যেই কথা সেই কাজ। জঙ্গল দিয়ে যাওয়ার সময় গাছের কাটার আঘাতে আমার পা কেটে যায়, অনেক রক্ত পড়ে। কিন্তু মিশন সাকসেসফুল হলো না।

পায়ের ব্যথায় আমার জ্বর এসে পড়ে। দালাল আমাকে জ্বর কমার ওষুধ এনে দেয় কিন্তু জ্বর সারে না। ব্যথায় পা ফুলে যায় এবং মাংসে পচন ধরে। ডাক্তার দেখাতে বলি, ডাক্তার দেখায় না। পায়ের ব্যথায় আমি চিৎকার করে কাদতে থাকি আমার সঙ্গের ছেলেদের দালাল সরিয়ে ফেলে আমার চিৎকার আর কান্নাকাটিতে পুলিশ ছুটে এসে আমাকে উদ্ধার করে হসপিটালে পাঠায়। সেখানে দশ দিনের মতো চিকিৎসাধীন রেখে পায়ের অবস্থা একটু ভালো হলে আমাকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়। যখন জিয়া এয়ারপোর্টে নামি তখন আমার কাছে ছিল একটি লাঠি যার সাহায্যে হেটে এসেছি এবং কিছু ডলার।

আজ আমার সেই ভাই হারুন ইটালিতে বসবাস করছে। জানি না তাকে নিয়ে এই লেখাটা তার হাতে পৌছাবে কি না।

ইমামগঞ্জ, ঢাকা থেকে

নির্বাক

– এস. এম সুমন

১৯৯৮ সালের শেষে কাতার এসেছিল হাদি। যে কম্পানি তাকে এনেছিল তার কাজ না থাকায় পাঠানদের সঙ্গে সে মাটি খোড়ার কাজ করতো। এ অসহ্য গরমে দুই তিন দিন পরই সে অসুস্থ হয়ে পড়লে এ কাজ ছেড়ে দেয়। সুস্থ হয়ে বাড়িতে দেয়ালে রঙ করার কাজ নেয়। কিছুদিন কাজ করার পর

বাশের সিড়ি ভেঙে নিচে পড়ে ডান হাত ভেঙে এক মাস *হামাদ হাসপাতালে* কাটায়। তারপর থেকে ভারী কোনো কাজ করতে পারে না। তাই এক ইনডিয়ান ছেলের সঙ্গে পত্রিকা বিক্রির কাজ করে।

সে মুগলিনা থাকে। এখানে ছোট ছোট পাচটা রুমের প্রতিটিকে চারজন করে বাংলাদেশি থাকে। এই পাচ রুমের জন্য একটা টয়লেট ও একটা রান্নাঘর। সকালে লাইন ধরে কাজ সারতে হয়। পাচ মিনিটের বেশি টয়লেট ব্যবহার করা নিষেধ। এটা এখানের নিয়ম।

হাদি–র বাবা মারা যাওয়ার পর তার মায়ের দ্বিতীয় বিয়ে হয়েছে। হাদির মা ছাড়া অন্য কেউ এই দুনিয়ায় নেই। তাই তাকে দেশে টাকা পাঠাতে হয় না। দুই বছরে সে নয় হাজার রিয়াল আমার কাছে জমা করেছে। তাকে বিভিন্ন বাসার আসবাবপত্র স্থানান্তরের কাজ নিয়ে দিয়েছি। সন্ধ্যার পর করে।

হাদি একদিন আমার কাছে জমা নয় হাজার রিয়াল চায়। তার টাকা তাকে ফেরত দিয়েছি। জানতে পারলাম এই টাকা সে তার ইনডিয়ান বন্ধুকে ধার দেবে। তাকে নিষেধ করলাম। সে আমার কথা শুনলো না।

দুই তিন দিন পর আমার কাছে হাদি এসে কেদে কেদে বলছে, ইনডিয়ান বন্ধুটি আরো দশ বারোজনের কাছ থেকে টাকা নিয়ে দেশ পালিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তার পত্রিকা বিক্রির পথও বন্ধ হলো।

হাদিকে একটা মুদি দোকানে কাজ ঠিক করে দিলাম। মালিক একজন কতোরিয়ান প্রাইভেট সেক্রেটারি। মালিক সন্ধ্যায় দোকানে বসেন। সারা দিন চাকরি করেন। দোকানের জন্য কর্মচারী বেলাল। হাদিকে মালিক মাসে ছয়শ দিনার দেবে এবং দিনে তিন বেলা খাওয়া দেবে। থাকার ব্যবস্থা নিজের।

হাদি প্রতিদিন দুপুরে হট পট–এ করে বেলাল ও নিজের জন্য খাবার আনতে মালিকের বাসায় যায়। মালিকের বিশ–বাইশ বছরের সুন্দরী স্ত্রী মোটেও পর্দা করে না। সে দুপুরের গোসল সেরে শুধু শাড়ি পরা অবস্থায় খাবার সাজিয়ে দেয়। হাদির সামনেই এক বছরের মেয়েকে বুকের দুধ খাওয়ায়। এতে করে হাদি প্রায় দিন মহিলার শরীরের অংশবিশেষ দেখে। মেয়েকে হাদির কোলে দেয়ার অজুহাতে মহিলা প্রায়ই তার নরম স্তন দিয়ে হাদির হাতে ধাক্কা দেয়। মহিলার স্বামী সকালে বের হয়, রাত দশটার পরই ঘরে ফেরে, দুপুরের খাওয়া তিনি বাইরে খান।

হাদি একদিন খাবার নিতে এসে দেখে মহিলা ভিসিআর–এ ব্লু ফিল্ম দেখছে। হাদিকে মহিলা পাচ মিনিট দেরি করতে বললো। হাদিও অপেক্ষা করতে লাগলো। এয়ারকন্ডিশন্ড ঘরে জানালা নেই। লাইট বন্ধ করলে রাতের মতোই অন্ধকার। মেয়েটি ঘুমুচ্ছে। মহিলাই লাইট বন্ধ করে দিল। তারপর হাদিকে পিঠে চুলকিয়ে দিতে বললো। হাদি নিরুপায় হয়ে পিঠে চুলকাতে লাগলো। এতে মহিলা খুশি হতে পারলো না।

মালিকের মানিব্যাগ হারিয়ে গেছে। অনেক খোজাখুজির পরও পাওয়া গেল না। কিছুদিন পর দুপুরে ভাত নিতে এসেছে বেলাল। বেলালের মাধ্যমে হাদির কাপড়ের ব্যাগটি তল্লাশি চালিয়ে মানিব্যাগটি উদ্ধার করে মহিলা। বেলাল ঘটনাটি হাদিকে খুলে বলে।

হাদি আশ্চর্য হয়! পরদিন হাদি দুপুরের খাবার নিতে এলে মহিলা বলে, তোমার ব্যাগে মালিকের মানিব্যাগ পাওয়া গেছে। কথাটা তোমার মালিককে বলবো।

হাদি ভয়ে কাপতে কাপতে বলে, আমি এর কিছুই জানি না। মানিব্যাগ চুরি করিনি। দয়া করে মালিককে বলবেন না।

তখন মহিলা মিটি মিটি হাসে এবং বলে, আমার কথা মতো চললে বলবো না।

হাদি বললো, আমি তো সব সময় আপনাদের কথা মতোই চলি।

মহিলা বললো, তাহলে লক্ষ্মী ছেলের মতো লাইট নিভিয়ে দাও। তারপর কাছে এসো।

হাদি লাইট নিভিয়ে কাছে আসে।

মহিলা বলে, আমার গায়ে চুলকিয়ে দাও।

হাদি চুলকাতে আরম্ভ করে। মহিলা বললো, আমি গোসল না করে তোমার অপেক্ষায় ছিলাম।

এভাবেই একটি বছর কেটে গেল। একদিন মালিক ঘরে মোবাইল ফোন ফেলে গেছে। সে মোবাইল নিতে দুপুরে ঘরে এসে ঘরের দরজা ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেল। তারপর লাইট জ্বালিয়ে দেখে তার স্ত্রী ও হাদি স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করছে।

তোমরা কি করছো বলার সঙ্গে সঙ্গে মহিলা কেদে কেদে বললো, হাদি জোর করে আমাকে ধর্ষণের চেষ্টা করছিল।

হাদি নির্বিকার হয়ে দাড়িয়ে রইলো। মালিক তার ইচ্ছামতো হাদিকে পিটিয়ে পুলিশে খবর দিল। পুলিশ তাকে নিয়ে ভরে দিল জেলহাজতে। কোরআনের আইনে বিচার হবে হাদির। হয়তো তার শিরচ্ছেদ হবে অথবা অন্য কোনো শাস্তি। কিন্তু প্রতারক মহিলা স্বামী নিয়ে ভালোই আছে।

এই ঘটনা বেলালের মুখ থেকে শুনেছি। এই লেখা পর্যন্ত হাদি জেলহাজতেই রয়েছে। চেষ্টা করবো তার মাধ্যমে প্রকৃত সত্যটা প্রকাশের। আমি যাবো হাদির সঙ্গে দেখা করতে।

কাসকো, কাতার থেকে

মাহাথিরের ভাষণ

– মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন

মালয়শিয়ার সরকার ইরাক যুদ্ধকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে। এ বিষয়ে সর্বপ্রথম বিরাট বড় জনসমাবেশ ঘটে কমনওয়েলথ উপলক্ষে যে বড় স্টেডিয়াম করা হয় সেখানে। মালয়শিয়ার প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ সকল নাগরিককে আহবান জানান।

সকল নাগরিক বলতে মালায়, তামিল, চায়নিজসহ সব জাতি ওই দিন মাহাথির মোহাম্মদের ডাকে সাড়া দেয়।

প্রায় দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার লোক সেখানে জমায়েত হয়। সেদিন হালকা–পাতলা বৃষ্টি ছিল। তারপরও মানুষ আমেরিকা ও বৃটেনের বিরুদ্ধে সরাসরি ধিক্কার দিয়েছে। এবং প্যালেস্টাইনিদের ওপর ট্যাংক হামলার প্রতিবাদ জানিয়েছে।

সেদিন আমিও সেই মিছিলে উপস্থিত ছিলাম। এটা আমার জীবনের বিরল এক মুহূর্ত।

মাহাথির মোহাম্মদ রাত আটটায় ভাষণ দেবেন। কিন্তু লোকজন বিকাল তিনটা থেকে স্টেডিয়ামে আসা শুরু করে। সাতটা থেকে একজন দুইজন করে ক্যাবিনেট মন্ত্রী আসা শুরু করেন। সাড়ে সাতটার ভেতর সবাই চলে আসেন।

সময়ের বিষয়ে খুবই সচেতন প্রধানমন্ত্রী মাহাথির যথাসময় এলেন সাধারণ একটা প্যান্ট ও একটা টি-শার্ট পরে। টি-শার্টে লেখা ছিল – *পেজ অফ মালয়শিয়া*। একজন প্রধানমন্ত্রীর গায়ে এমন ধরনের স্লোগান থাকবে ভাবাই যায় না। মাহাথির মোহাম্মদ পশ্চিমাদের সরাসরি দোষারোপ করে বক্তৃতা দেন। এক ঘণ্টার বক্তৃতার মধ্যে ইহুদিদের ইসরেল সমস্যা যে পশ্চিমাদের হাত বা ইন্ধনে হচ্ছে সেটা সরাসরি বলেন।

মুসলমানদের পিঠ দেয়ালে লেগে গিয়েছে। কোনো উপায় না দেখে তারা সন্ত্রাসী হামলা চালায়। আমেরিকা কখনো চিন্তা করে দেখে না যে, সন্ত্রাসী হামলার কারণ কি? কেন সন্ত্রাসী হামলা চলে তার উৎস খুজে বের করতে হবে তাদের।

সন্ত্রাসী হামলার ওপর কথা বলতে গিয়ে মাহাথির বলেন, আজ আমরা বিমানে চড়তে পারি না। হোটেলে থাকতে পারি না। পায়ে জুতা দিতে পারি না।

যখন মাহাথির আমেরিকা ও বৃটেন বিরোধী বক্তৃতা শেষ করেন তখন মালয়শিয়ার ক্রীড়ামন্ত্রী পাচ লাখ লোকের ইরাক যুদ্ধ বিরোধী স্বাক্ষর মাহাথিরের হাতে তুলে দেন।

এ দেশের জনগণের কথা সরকার শোনে এবং ভালো প্রস্তাবগুলো মেনে নেয়। সরকারের আদেশ, উপদেশগুলো জনগণ দেখে এবং মেনে চলে।

২০ তারিখে যুদ্ধ শুরু হয় মালয়শিয়ান সময় সকাল সাড়ে দশটায়। জনগণের উদ্দেশে সোয়া এগারোটায় উপপ্রধানমন্ত্রী আবদুল্লাহ আহমেদ বাদাবী ভাষণ দেন। তিনি অনুরোধ করেন, জনগণ যেন শান্ত থাকে, কোনো প্রকার নাশকতামূলক কাজ না করে। সরকার কড়া নজর রাখছে এই যুদ্ধে।

যখন যুদ্ধ শুরু হয় তখন মাহাথির দুই মাসের ছুটিতে ব্রাজিলে যান। ব্রাজিল থেকে তিনি বিবৃতি দিয়ে যুদ্ধের বিরোধিতা করেন।

এই পর্যন্ত অনেক নেতা যুদ্ধ বিরোধী অবস্থান নিয়েছে ঠিক কিন্তু মাহাথিরের মতো সাহসী ভূমিকা কেউ নিয়েছেন বলে মনে হয় না।

যুদ্ধের পঞ্চম দিন ক্রীড়ামন্ত্রীসহ আরো কয়েকজন মন্ত্রী চেয়েছিলেন তারা এক লাখ লোকের জনসভা করবেন। স্থান নির্ধারণ করেছিল কে.এল.সি.সি অর্থাৎ পেট্রনাস টাওয়ার। পেট্রনাস টাওয়ার থেকে বৃটিশ, ইউএস এমবাসির দূরত্ব আধা কিলোমিটার। মালয়শিয়ার পুলিশ অনুমতি দেয়নি এ জন্য যে, নিরাপত্তায় ব্যাঘাত ঘটতে পারে।

তখন ওই সব মন্ত্রীরা একটা নির্দিষ্ট স্থান দেয়ার জন্য পুলিশ প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করেন। তারা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাই বড় বড় মন্ত্রী হয়েও পুলিশের সঙ্গে বিরোধে যান নি।

এরপর দোতারান মিরডিকায় অর্থাৎ হাই কোর্ট ভবন প্রাঙ্গণে সমাবেশ করার অনুমতি দেয়। ওই দিন প্রায় ৭০ হাজার লোক হয়।

মাহাথির বলেছেন, জাতিসংঘের আর প্রয়োজন নেই। তার কার্যক্ষমতা দুর্বল হয়ে গেছে। কফি আনানকে পদত্যাগ করার জন্য তিনি আহবান জানান এবং সকল নাগরিককে অনুরোধ করেন ইরাকিদের জন্য সাহায্য করার।

মাহাথিরের পরামর্শে একদল স্বেচ্ছাসেবক দল আম্মানে অবস্থান করেন এবং প্রতিদিন ইরাকিদের দুঃখ দুর্দশার খবর পাঠান।

সত্যিই যুদ্ধের বিপক্ষে অবস্থা নিয়ে কড়া সমালোচনা করে এবং যুদ্ধকে নিষিদ্ধ করা হোক এ দাবিগুলো রেখে মাহাথির প্রমাণ করেছেন যে, তিনি সত্যিই এশিয়ার বাঘ।

মালয়শিয়া থেকে

আদম ব্যাপারীর বৌ

– লিটন

বিক্রমপুরের ছেলেরা আজকাল দলে দলে বিদেশ চলে যাচ্ছে। যাদের টাকার অভাব নেই তারাও যাচ্ছে। আবার যাদের অভাব আছে তারা তো পারলে কাথা বালিশ সব বিক্রি করে দেশের মায়া ছেড়ে বিদেশে চলে যাচ্ছে। অনেক বাবা ছেলের দাড়ি–গোফ না গজাতেই বিদেশে পাঠিয়ে দিচ্ছে। এসব কারণে বিক্রমপুরের উচ্চ শিক্ষার মান কমে যাচ্ছে।

স্কুল কলেজে এখন ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যা বেশি। মেয়েরা শিক্ষিত হলেও তারা এখন শিক্ষিত স্বামী পায় না। তাদের বিয়ে করে জাপান বা কোরিয়া ফেরত অশিক্ষিত টাকাওয়ালারা। সে যাই হোক। বিক্রমপুরের মালপদিয়া গ্রামের এক যুবক বিদেশে যাওয়ার জন্য টাকা দিয়েছিল বাহেরকুটি গ্রামের এক আদম ব্যাপারীকে। কিন্তু আদম ব্যাপারী তাকে বিদেশে না পাঠিয়ে তার টাকা মেরে দিয়ে নিজেই বিদেশে চলে যায়।

তারপর অনেক কষ্টে আবার টাকা সংগ্রহ করে অন্য আদমের সাহায্যে সে বিদেশে যায়। যাওয়ার সময় তার বন্ধুকে বলে যায় আদম ব্যাপারীর স্ত্রীর কাছ থেকে টাকা আদায় করার জন্য। ব্যাপারী তো চলে গেছে বিদেশে।

এখন বাড়িতে আছে ব্যাপারীর স্ত্রী। কিছুদিন পর বন্ধু আদম ব্যাপারীর স্ত্রীকে চাপ দেয় তার বন্ধুর টাকার জন্য। কিন্তু আদম ব্যাপারীর স্ত্রী টাকা দেয় না। এক দিন দুই দিন টাকা চাইতে যেতে যেতে তার স্ত্রীর সঙ্গে বন্ধুর খাতির জমে যায়। আদম ব্যাপারীর স্ত্রী খুব সুন্দরী। বিয়ে হয়েছে মাত্র ছয় মাস, কাচা যৌবন।

বন্ধু আদম ব্যাপারীর স্ত্রীর রূপ ও স্তন দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। সে আর তার বন্ধুর পাওনা টাকা চায় না। একদিন তাকে রাতে যেতে বলে। ভয়ে ভয়ে রাতে সে যায়। রাতে যাওয়ার ইঙ্গিত সে বুঝতে পারে। আদম ব্যাপারীর স্ত্রী তার যৌবন সপে দেয় বন্ধুর হাতে।

সে এখন প্রতি রাতেই তার যৌবন সুধা পান করে। বন্ধুর পাওনা টাকা চাইতে আর মনে থাকে না।

বিদেশ থেকে বন্ধুর কাছে চিঠি দেয় আমার টাকাটা ওঠানোর ব্যাপারে তুমি কি পদক্ষেপ নিলে আমাকে জানাও। বন্ধু চিঠির উত্তর দেয়, দোস্ত, তোমার টাকা ওঠানোর জন্য খুব চেষ্টা করছি। ওঠাতে পারলেই খবর দেবো।

ইতিমধ্যে প্রবাসী বন্ধুটি লোক মারফত খবর পেয়েছে যে, তার বন্ধু আদম ব্যাপারীর স্ত্রীর স্তন দেখে সব কিছু ভুলে গেছে। সে তোমার টাকা ওঠাতে পারবে না। এ খবর পেয়ে বন্ধুর কাছে সে মনের দুঃখে একটা চিঠি পাঠায়। চিঠি এই রকম :

বন্ধু

বড় আশা করে তোমাকে আমার টাকা ওঠানোর দায়িত্ব দিয়েছিলাম। ভেবছিলাম, তুমিই আমার টাকাটা ওঠাতে পারবে। এখন দেখছি তুমি আদম ব্যাপারীর স্ত্রীর রূপে মগ্ন হয়ে আছো, টাকা চাইতে গেলে তাকে দেখে টাকা চাওয়ার কথা ভুলে যাও। দোস্ত রে, আমার টাকাটা ঠিকই পেতাম যদি আদম ব্যাপারীর স্ত্রী সুন্দরী না হতো।

মুন্সিগঞ্জ থেকে

ধূপকাঠি

– বেন বিল্লাহ

ভ্যালেনটিনা–কে আমি কখনো ভালোবাসিনি, এক বিন্দুও নয়। যেহেতু আমরা একই টেবিলে বসে ইটালির ভাষার ব্যাকরণ মুখস্থ করি, তাই ইওরোপিয়ান ভদ্রতা মতো স্কুলের দরজার সিড়িতে, বার–এ দেখা হলে প্রচণ্ড কৃত্রিম আবেগ মিশিয়ে বলতে হয়, Ciao (হ্যালো), Come stai, কেমন আছো? (ইত্যাদি)। তারপর দুই চার ফাও প্যাচাল পাড়ার পর Arrivederci (শুভ বিদায়) বলার সঙ্গে সঙ্গেই ইওরোপিয়ানদের মতোই সব ভুলে যাই। মনেই করি না যে, একইমাত্র একটা জীবের সঙ্গে কথা বললাম এবং সেই জীবটা একটা জ্বলজ্যান্ত নারী।

ওর কতোগুলো আচরণ ক্লাসের অন্যান্য ছাত্রের জন্য ঈর্ষা এবং আমার জন্য বিব্রতকর হয়ে দাড়াচ্ছিল। যেমন আমার সর্দি লেগেছে, সে অমনি যাবে পাচতলার সিড়ি বেয়ে নিচে তলার কফি মেশিন থেকে লেবু চা আনতে। কখনো চোখ খচ খচ করছে, সঙ্গে সঙ্গে ফার্মাসি থেকে ওষুধ এনে হাজির। কোনোদিন হয়তো সে ক্লাসে আসেনি, আরাম মতোই বসে ক্লাস করছি। হঠাৎ এক সময় পেছন থেকে দুটো সরু হাত এসে আমার চোখ চেপে ধরলো। তারপর বুকের নরম মাংসপিণ্ড এসে ঠেকলো আমার পিঠে।

আমি হো হো করে হেসে উঠে বলি, ভ্যালেনটিনা। মনে মনে বলি *শাদা কুত্তি*।

এই ইওরোপিয়ান কুত্তি নিয়ে আমি কি করি! এ দেখছি এক মস্ত ঝামেলা। বন্ধুরা কেউ কেউ জানান দেয়, দোস্ত চালিয়ে যাও। কখনো কখনো শিক্ষকও বন্ধুর ভূমিকা নেয়। এভাবে আর কতোদিন চলা যায়! সতী নারী এবং অপ্রেমিক ছেলের সুনাম বাংলাদেশে। এখানে এ দুটোকেই মানসিক রোগীর পর্যায়ে ধরা হয়।

এখানে একটা যুবতী মেয়েকে সব সময় নীরব দেখালে ওই অসুস্থ পর্যায়ে পড়তে হবে। তাই একদিন নির্জন করিডোরে কতোটা তাচ্ছিল্যের সুরে বললাম, Valentina ti amo (ভ্যালেনটিনা, তোমাকে ভালোবাসি)।

পাশের রুমগুলোতে ক্লাস হচ্ছিল। আমাকে হাত ধরে এক সিড়ি নিচে নিয়ে জড়িয়ে ধরে জানালো, Billah, anche io ti amo tanio, tanto. (বিল্লাহ, আমিও তোমাকে অনেক ভালোবাসি)। তারপর জাপটে ধরে ওর টসটসে ঠোট দুটো ভর করলো আমার সিগারেট ফোকা কালো ঠোটে।

শুরু হলো আমার মেকি কড়া প্রেম। উদ্দাম গতিতে। হাটে–মাঠে, পার্কে, ময়দানে, বাসে, ট্রামে, মেট্রতে, পৃথিবীর সর্বস্তরে। কারণ ইওরোপিয়ানদের উন্মুক্ত প্রেমনীতিতে কাউকেই পরোয়া করার দরকার পড়ে না।

প্রথমে দিন একবার দেখা হলেই চলতো, ক্রমেই বাড়ছে। সন্ধ্যা সাতটায় এক সঙ্গে ক্লাস করে ফিরেও ঘুমাতে যাবার আগে একবার আমার টেলিফোনে চুমু না পেলে তার রাতে ঘুম হয় না।

জানি, ইওরোপিয়ানরা এ রকমই প্রথম কয়দিন খুব আবেগ দেখাবে যেন ভালোবাসার জন্য পৃথিবীও ছাড়তে পারে। অথচ ঘর বাধতে গেলেই বিড়ম্বনা, পান থেকে চুন খসলেই তার সব ভালোবাসা মুহূর্তে জানালা দিয়ে পালাবে। তার সপ্তাহ খানেক বাদেই হয়তো দেখা যাবে, নতুন প্রেমিকের হাত ধরে দিব্যি হাটছে, অন্য কাউকে যে সে ভালোবেসেছিল এটা বেমালুম ভুলে যাবে।

ঘটলোও তাই। প্রায় বছর খানেক খামাখা *প্রেম প্রেম* খেলে একদিন সামান্য ঘটনায় সব প্রেম জলে গেল। আমিও হাপ ছেড়ে বাচলাম।

প্রেম ভাঙার কারণ বড় কিছু নয়। সেদিন সন্ধ্যায় তার দেশে ফোন করবে বলে একটা ফোনের দোকানে গিয়েছিলাম। ভ্যালেনটিনা ক্যাবিনের ভেতর ঢুকে কথা বলছে, আমি সামনের একটা বেঞ্চে দুই তিনটা নিগ্রো মেয়ের সঙ্গে বসে আছি। নিগ্রো মেয়েদের চুল বাধার ঢঙটা চমৎকার!

সত্যি বলছি, সেদিন আমি কৌতূহলবশত ওদের চুলগুলোতে হাত দিয়েছিলাম। এ কথা আমার চিন্তাতেও আসেনি যে, ইওরোপিয়ান মাটিতে কোনো মেয়ে এই তুচ্ছ ঘটনাটা দেখে হিংসা করবে।

ও টেলিফোনের রিসিভারটা আছড়ে রেখে Come moi! (কিভাবে সম্ভব) বলে চিৎকার দিয়ে বুথ থেকে বেরিয়ে এলো এবং আমার হাত থেকে ভ্যানিটি ব্যাগটা কেড়ে নিয়ে মুহূর্তে কেদেকেটে আমার চোদ্দগুষ্ঠি উদ্ধার করে, গালিগালাজ করে পাশের ট্রাম স্টপেজ থেকে ট্রাম ধরে চলে গেল।

ভ্যালেনটিনার সঙ্গে আমি যতোই প্রেমের পাকা অভিনয় করি না কেন, অন্ধকার মনের গভীরে যে নামটা লক্ষ্য কোটিবার জপমালার মতো জিকির করে যাই তা আমার মেহেরুন (মিরু)। বাংলাদেশের এক আধা শহরের বাসিন্দা। মিরু আমার শয়নে, স্বপনে, তন্দ্রা, জাগরণে পুরো অস্তিত্ব জুড়ে মেখে থাকে। একটানা সাত বছর প্রবাসে এ ব্যতিক্রম হয়নি। ওকে হারানোর কথা কল্পনাও করতে পারি না। তাই কখনো হারানোর সংশয়ে ভুগিনি। জন্ম থেকেই যেন সে আমার হয়ে জন্মেছে।

২০০০–এর ছুটিতে অল্পদিনের জন্য দেশে গেলাম। মূল প্রয়োজনটা হলো, বিয়ের কাগজপত্রগুলো তৈরি করে এনে ওকে আনার ব্যবস্থা করতে হবে। এ কথা সবারই জানা। তাই যাবার আগে কাউকে ঘটা করে জানানো হয়নি।

বাড়িতে গেলাম। সব ব্যাপারগুলোই সরগরম শুধু আমার বিয়ের ব্যাপারটায় কেন যেন সবাই নীরব ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বুঝতে পারছি সবাই স্বার্থহানির কথা ভাবছে। যাই হোক। দরকার হলে সব ব্যবস্থা আমি একাই করবো।

তৃতীয় দিনে ট্রেন ধরে মামার বাড়ি গিয়ে পৌছালাম যেখানে আমার ছাত্র জীবনের অনেকগুলো বছর কেটেছে। আমি মিরু আরো কতোশত বন্ধুবান্ধব। কতো স্মৃতি! দরজার টোকা দিতেই যে খুলে দিল সেই মিরু। প্রায় বছর আটেক আগেও একবার কিছুদিন স্বেচ্ছা নির্বাসন থেকে গিয়ে ওকে চমকে দিয়েছিলাম। আজ দুজনই চমকে উঠলাম। চেহারায় ভীষণ পার্থক্য, মিরু আর সে তন্বী তরুণী নেই। কিছুটা মোটাসোটা এক পূর্ণাঙ্গ মহিলা হয়েছে। যাক, বিহ্বলতা কাটিয়ে আমিই প্রথমে জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন আছো মিরু?

তারপর কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তার পিছে পিছে গিয়ে ড্রয়িংরুমে বসলাম। কি ভাবছি তা নিজেও জানি না।

কোনো কিছুই বুঝতে বাকি রইলো না। কিন্তু নিজেকে কোনোমতেই সামলাতে পারছিলাম না যেন আমার বুকের ভেতরকার শিরা, উপশিরাগুলো একটা একটা করে ছিড়ে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, আমার জীবনের সামনে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। হাসি–আনন্দ বা অন্য কোনো চাওয়া–পাওয়া। দ্রুত রুম সংলগ্ন বাথরুমটাতে গিয়ে ঢুকলাম। নাকে–মুখে রুমাল চাপা দিয়েও নিজেকে সামলাতে পারছিলাম না। আমি এক কঠিন পুরুষ, বুদ্ধি হওয়ার পর থেকে কখনো কেদেছি বলে মনে পড়ে না। কিন্তু সেদিন আমার বুকটা ফেটে যাচ্ছিল।

ওর সঙ্গে মোটেও কথা বলার সুযোগ হচ্ছিল না, এক মুহূর্ত নির্জনতার সুযোগ ওকে শুধু জিজ্ঞাসা করলাম এটা কেমন করে সম্ভব হলো মিরু।

সে আমাকে যা জানালো তার সংক্ষিপ্ত হলো এ রকম : ওর বাবার ইচ্ছা নয় যে, আমার মতো বাউন্ডেলে, অর্ধশিক্ষিত, প্রবাসী ছেলের সঙ্গে বিয়ে হোক। তাই শিক্ষিত এক ধনী জামাই দেখে মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। এখন তার পেটে বাচ্চা।

রাত ভর বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুধু সাত বছর আগের স্মৃতিগুলো রোমন্থন করলাম এবং নীরবে বালিশ ভেজালাম। সকালবেলা উঠেই বিদায় নিলাম। কেউই তেমন থাকার জন্য কোনো জোর করলো না, বরং বোধহয় চাচ্ছিল, আমি যতো তাড়াতাড়ি বিদায় নিই ততোই ভালো। আমার তাই মনে হয়েছিল। বাড়িতে ফিরে আরো দশ বারো দিন থাকলাম, কোথাও কোনো ভালোলাগার উপকরণ খুজে পেলাম না। তাই পনেরো দিনের মাথায় আবার উড়াল দিলাম।

আবার কাজের মধ্যে ডুবে গেলাম। কারখানার নয় দশ ঘণ্টা সময় যন্ত্রের সঙ্গে বেধে দিয়ে ভালোই কাটে, তাতে মন যন্ত্রের তালে চলতে গিয়ে অন্য কিছু ভাবার সময়ই পায় না। বাসায় ফিরে যখন সময়টা অত্যন্ত দীর্ঘ মনে হয় তখন মনটাকে ভিজে রাখি ভিনো (Vino) নামে এক প্রকার জল দিয়ে। সেদিনও রাতে ডাইনিং টেবিলে বসে ওই আঙুরের রস সেবন করছিলাম। করিডোরে রাখা টেলিফোন সেটটা বিরক্তিকরভাবে বেজে উঠলো।

ধরলো গিয়ে আমার এক রুমমেট।

ফোনটা আমার হওয়াতে সুধা আগন ছেড়ে উঠতে হলো। বিরক্তির স্বরে বলে উঠলাম, হ্যালো।

অপরপ্রান্ত থেকে একটা চেনা নারী কণ্ঠ ভেসে এলো, Ciao, come stai amore? (হ্যালো, কেমন আছো প্রিয়?)।

হ্যা ভালো, খুব ভালো আছি আমি। তুমি কেমন আছো?

Bene (ভালো)।

বললাম, তারপর বলো কেন ফোন করছো?

Hai bevuto troppo? (তুমি কি খুব বেশি ড্রংক করেছো?)।

Si (হ্যা)।

আর কোনো সাড়াশব্দ নেই, শুধু কান্নার আওয়াজ আর ফোপানো নিঃশ্বাসের শব্দ। মদ দ্রব্যটার যতোই বদনাম থাক। কিছু গুণও বোধহয় আছে। তা না হলে সেদিন ওকে আমি কোনোমতেই সহ্য করতে পারতাম না। প্রশ্নই আসে না। অথচ সেদিন আমার ওর প্রতি মায়া হলো। সে আমার সঙ্গে দেখা করার অনুরোধ করলে আসতে বলে ডাইনিং টেবিলে বসেই গ্লাসের পর গ্লাস গিলছিলাম।

পরদিন ছিল রবিবার। ঘণ্টা দেড়েক পর কলিংবেলের শব্দ শুনে দরজা খুলে দিতে উঠতেই মাথাটা ঘুরে উঠলো। কোনো রকম সুইচ টিপে মেইন গেট খুলে বাসার দরজাটা খুলে দিতে না দিতেই আর ধরে রাখতে পারলাম না, বমি করে ঘর ভাসিয়ে দিলাম। দেখলাম সে দৌড়ে এসে Oh dio mio! (হায় আল্লাহ) বলে আমার মাথাটা ধরলো।

এরপর আর কি হয়েছে বলতে পারি না। সম্ভবত রাত তিনটার দিকে প্রচণ্ড তৃষ্ণায় ঘুম ভাঙলো। দেখি খাটে শুয়ে আছি। আমার পাশে ভ্যালেনটিনা বসে আমার একটা হাত নিয়ে নাড়ছে। সেদিনই প্রথম ওকে অন্তরঙ্গভাবে উপলব্ধি করলাম। মনে হলো, ওর সঙ্গে যেন আমার কতো জনমের হৃদ্যতা। তবুও সংকোচে জিজ্ঞাসা করলাম, বাসায় যাওনি কেন?

বললো, তোমাকে এভাবে ফেলে রেখে কিভাবে যাই।

এসো আমার কাছেই শোও।

সে কোনো কথা না বলে বসেই রইলো।

হাত ধরে টেনে আমার খাটে শুয়ে দিয়ে কম্বলের ভেতর টেনে নিলাম। শুয়ে আমার পায়ের ওপর দিয়ে এক পা, বুকের ওপর এক হাত দিয়ে মুহূর্তে ঘুমিয়ে গেল। একটা নারী একটা পুরুষকে জড়িয়ে ধরে, এভাবে ঘুমাতে পারে, এতো প্রশান্তির ঘুম! তা আমার অজানা ছিল। সারা রাত শুধু তার দেহলতায় জড়িয়ে ছিলাম। এক বিন্দুও ঘুমাতে পারিনি।

এই ঘটনার তিন মাস পর ওকে বিয়ে করি। রোম শহরে চাকরির সুবিধা নেই বলে এই Castel Franco শহরে চলে এলাম। তাও আজ প্রায় দেড় বছর অতিবাহিত হয়ে চললো।

দুইজনে চাকরি করি, বাসায় ফিরে মিলেমিশে রান্না করি, খাই, তর্ক করি, টিভি চ্যানেল নিয়ে কাড়াকাড়ি করি, ঝগড়াও করি, মান–অভিমানও হয় তবুও চমৎকার চলছে। জীবনের কাছে আমার আর খুব বেশি চাওয়ার নেই। একজন বিদেশিনী মেয়ে আমাকে খুশি করার জন্য কতো কি করছে তা চিন্তা করলেও তার প্রতি আমার আরো মায়া লাগে। জানি না এটাই ভালোবাসা কি না।

এখন রোজ বিছানায় শুয়ে তাকে আমি বাংলা ভাষা শেখাই। খুব বেশি মনে রাখতে পারে না। তবুও যেটুকু শিখেছে তাতেই কোনো অপরিচিত বাঙালিকে চমকে দিতে পারে।

ইটালিতে অনেক বাঙালিই বাড়ি কিনেছে। আমরাও চমৎকার একটা বাড়ি কেনার স্বপ্ন দেখি। পৃথিবীর সব মেয়েরা বোধহয় নিজের একটা বাড়ির জন্য আজন্ম স্বপ্ন দেখে। সম্পূর্ণ নিজের মতো একটা ঘর সাজাতে চায়। এতে আমি কোনো পার্থক্য দেখি না বাংলার কোনো পল্লি বধূ অথবা সুদূর ইউক্রেনের এই শ্বেতাঙ্গ নারীতে। এখন আমার মনে হয়, পৃথিবীর সমস্ত নারী পুরুষে মূলত কোনো তফাৎ নেই। উপরেই যেটুকু পার্থক্য। ভেতরে সব একা।

এ পোড়া প্রবাস আমার জীবন থেকে অনেক কিছুই কেড়ে নিয়েছে। জীবনের প্রথম প্রেম, বাবা-মায়ের স্নেহ, বন্ধু-বান্ধবের মধুর সঙ্গ, ছোট ভাইবোনের ভালোবাসা, কতো অনুষ্ঠান-আয়োজন, কতো প্রিয়জনের মৃত্যুতে একটু চোখের দেখার সাধ আরো কতো কি! এ শুধু আমার একার জীবন থেকে নয়, আমার মতো আরো লাখ লাখ হতভাগ্য প্রবাসীর।

বাংলাদেশের কথা ভাবতে গেলেই মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে আসে। পৃথিবী চলছে কোথায় আর আমরা চলছি কোথায়! বাংলাদেশের রাজনীতিবিদ, পুলিশ, প্রশাসন, ধর্মান্ধ সম্প্রদায় সব মিলিয়ে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করে চলেছে তাতে ঘৃণায় থুথু ছেটানো ছাড়া আর কি বা করার আছে! প্রতি বছর হাজার হাজার অসহায় যুবক ছুটছে এই প্রবাস নামে নরকের দিকে, অথচ পরিস্থিতি একটু ভিন্ন হলেই সোনার ছেলেরা বাংলার সত্যি সত্যি সোনা ফলাতে পারতো।

যাই হোক। প্রবাস আমার জীবন থেকে অনেক কেড়ে নিয়েছে। তার বদলেও যা দিয়েছে তাতেও এই প্রবাসকে ধন্যবাদ। আমি অর্থনৈতিক সংকটে বেশি দূর লেখাপড়ায় এগোতে পারিনি। প্রবাসে এসেছি বলেই আমার ছোট ভাইবোন নিশ্চিন্তে লেখাপড়া করে যেতে পারছে এ জন্য আমার পরিবার থেকে এই প্রবাসকে হয়তো ধন্যবাদ দেবে।

ধূপকাঠি যেমন নিজেকে পুড়িয়ে সুগন্ধ বিলি করে তেমনি এ বাঙালি জাতির লাখ লাখ নারী-পুরুষ প্রবাস নামে আগুনে পুড়িয়ে যে সুগন্ধী বিলি করছে তার নাম অর্থ। এর জন্যও হয়তো বাঙালি জাতি ধন্যবাদ দেবে।

ইটালি থেকে

ভাই

– সৈয়দ আবদুর রহমান

১৯৯৫ সালে ঈদগাও আদর্শ শিক্ষা নিকেতন কেজি স্কুল থেকে এসএসসি পাস করার পর ভর্তি হলাম ঈদগাও ফরিদ আহমদ কলেজে। কলেজে মাস তিনেক যাওয়ার পর দেখলাম বন্ধুদের মধ্যে অনেকে বিদেশ পাড়ি দেয়ার প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলেছে। এক সময় ঠিকই তারা বিদেশ (সউদি আরব) চলে গেল।

আমিও তখন বাবা মাকে আমার বিদেশ যাওয়ার ইচ্ছার কথা জানাই। বাবা আমাকে প্রবাস জীবনে তার নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা বলে বিদেশ যাওয়ার প্রতি নিরুৎসাহিত করেন। ইতিমধ্যে আমার এক আত্মীয় আমার জন্য একটি ভিসা পাঠায়। যখন ভিসা হাতে পেলাম তখন লেখাপড়ার প্রতি

কেমন জানি মায়া জমে যায় খুব বেশি। এ অবস্থায় নিজেই বিদেশ গিয়ে লেবার হিসেবে কাজ করার ইচ্ছে বাদ দিলাম। এবং পড়ালেখার প্রতি মনোযোগ দিলাম দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে।

আমার জন্য পাঠানো ভিসাটি নিয়ে আমার ছোট ভাই সউদি আরব চলে যায়। যদিও আমার ছোট ভাই ভিসা নিয়ে বিদেশে গিয়ে লেবারের কাজ করার মতো প্রাপ্ত বয়স্ক হয়নি তখনো। তবুও টাকা পয়সার বিনিময়ে ছোট ভাইকে ভিসার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি হিসেবে তৈরি করে তাকে বিদেশে পাঠিয়ে দিই। ভিসা নিয়ে বিদেশে যাবার সময় তার বয়স ছিল মাত্র পনেরো ষোল বছরের মতো।

বিদেশে গিয়ে আমাদের কাছে সে চিঠি লিখতো, বড় ভাই, আমি আম্মার উদর থেকে ভূমিষ্ঠ হবার পর পৃথিবীর অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া ও অসুস্থ পরিবেশের মধ্যে এসে যেমন চিৎকার করে কান্নাকাটি করেছিলাম এখন আমার অবস্থা ঠিক তেমনই।

তার সে করুণ আর্তনাদ মিশ্রিত চিঠি পড়ে এখানে আমাদের অবস্থা আরো কাহিল। এক লাখ পয়তাল্লিশ হাজার টাকা নগদ খরচ করে বিদেশে গিয়ে সে ফেরত আসার চিন্তাও করতে পারছে না।

এখানে আমাদের বাড়ির লোকজনের অবস্থা তার জন্য কতো ডিগ্রি নিচে নেমে গিয়েছে তার বলাই বাহুল্য। কারণ সে ছিল একদিকে অপ্রাপ্তবয়স্ক, অন্যদিকে বিদেশে থাকার মতো প্রয়োজনীয় লেখাপড়াবিহীন। কাজেই কতোদিন অনাহারে–অর্ধহারে ঘুমিয়েছিল বা পরবর্তীকালে তার এক বন্ধুর মুখ থেকে শুনেছি।

সউদি আরবের মতো কফিল নামের (ভিসাদাতা) কিছু লোক যে কি পরিমাণ নিষ্ঠুর হতে পারে তার একমাত্র ভিকটিম হচ্ছে আমার ভাই।

চার পাচটি কফিল পরিবর্তন করার পর (একটা কফিল থেকে আরেকটি কফিলের কাছে যেতে চাইলে নাকি দুই তিন হাজার রিয়াল প্রয়োজন হয়) এখন সে কোন অবস্থায় আছে বলতে পারছি না। আমার ছোট ভাইকে বিদেশ পাঠিয়ে ভাইয়ের প্রতি অবিচার করা হলো কি না তা বুঝতে পারছি না। কারণ অনেক নিঃস্ব মানুষ বিদেশ সউদি আরব গিয়ে আকাশচুম্বি অট্টালিকার মধ্যে ঘুমাচ্ছে। আর আমার অপ্রাপ্তবয়স্ক ছোট ভাই এখনো কফিলের অত্যাচার থেকে মুক্ত হতে পারছে কি না সেটা ভাবছি।

ঈদগাও, কক্সবাজার থেকে

অপারগ

– মনিরুল ইসলাম

২০০০ সালের মে মাসের কোনো একদিন কুয়ালা লামপুর থেকে উত্তর অঞ্চলীয় দ্বীপ শহর পেনাং আইল্যান্ডে যাচ্ছি বাল্যবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। কে.এল থেকে পেনাং আইল্যান্ডের দূরত্ব মাত্র সাড়ে তিনশ কিলোমিটার। পাচ ছয় ঘণ্টার জার্নি।

রাত সাড়ে এগারোটার টিকেট করেছি। নির্ধারিত সময়ের আধা ঘণ্টা আগেই বাস হাজির। সাইত্রিশ সিটের বাসে আমার সিট নাম্বার হচ্ছে তেরো। বাসের ডানপাশে ডাবল সিট এবং বাম পাশে সিঙ্গল। ডান পাশের বারো এবং তেরো নাম্বার সিট একই সঙ্গে। বাসের ভেতরে উঠে আমি বারো নাম্বার সিটে

বসে আছি। ভাবছি কেউ যদি আসে তাহলেই আমি আমার নির্ধারিত সিটে গিয়ে বসবো। বাস ছাড়তে তখনো পনেরো মিনিট বাকি আছে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছি একটু অন্য মনস্ক হয়ে।

এক্সকিউজ মি।

কে আবার ক্ষমা চাচ্ছে আমার কাছে? ঘাড় ফিরিয়ে দেখি বিশ বাইশ বছরের এক নাক চ্যাপটা তরুণী অর্থাৎ চায়নিজ।

ওহ, শিওর বলে আমার সিটে বসলাম এবং ওই তরুণীকে তার নিজ আসন অলংকৃত করতে বললাম। মিনিট পাচেক পরে বাস যাত্রা শুরু করলো। ভাবছি চুপচাপ বসে থাকা ভালো। তবে কোনো মেয়েদের সামনে চুপচাপ বসে থাকলে নিজের কাছে নিজেকে বেশ বোকা বোকা লাগে। তাই অগত্যা ব্যাগ থেকে ওয়াকম্যান বের করে ইয়ারপিস কানে গুজে দিলাম। বাস ধীরে ধীরে কে.এল সিটি থেকে বের হয়ে হাইওয়েতে উঠে তার নির্দিষ্ট গতিতে চলতে লাগলো।

ভাবলাম এখন একটু ঘুমের চেষ্টা করা যাক। যদিও ইচ্ছা ছিল সিট টেনে একটু ইজি হয়ে ঘুমাবো। কিন্তু পাশের তরুণীটি দেখি সিট নরমাল অবস্থায়ই চোখ বুজে রয়েছে। এ জন্য আমিও একইভাবে চোখ বুজে থাকলাম। ঘুমিয়েই গিয়েছিলাম। ঘুমের মধ্যেই মনে হলো কাধের ওপর বেশ বড় সাইজের নরম পাকা আম গড়াগড়ি খাচ্ছে। হঠাৎ ঘুম ভাঙলে দেখি পাশের মেয়েটি আমার কাধে মাথা রেখে নিশ্চিন্ত মনে গভীর ঘুমে। ডাকলাম না, এমনকি কোনো প্রকার নড়াচড়াও করলাম না। হোক না সে চায়নিজ মেয়ে! কল্পনায় তাকে নিয়ে চলে গেছি অন্য এক রহস্যময় জগতে।

পথিমধ্যে আধা ঘণ্টার যাত্রাবিরতি আছে। বাসটি থামলো। বাসের যাত্রী সবাই বাইরে বের হচ্ছে। সবাই যার যার মতো টি, কফি অথবা বাথরুমে যাচ্ছে। আমিও বের হবো। এসি-র বাতাসে যে শীত পড়ছে তাতে আগুন গরম এক কাপ কফি নিতেই হবে।

এরই মধ্যে দেখি মেয়েটি আড়ামোড়া করে জেগে উঠলো। আমার দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে অবাক হয়ে, আই অ্যাম সরি। আই অ্যাম সো সরি। ফরগিভ মি।

ওকে, নেভার মাইন্ড। মনে মনে বললাম, তোমার মতো কেউ সারা জীবন আমার কাধে মাথা কেন বসে থাকলেও যে এ অধম সন্তুষ্ট। মুখে বললাম, চলো, বাইরে বের হই।

বাইরে গিয়ে একটি কফি শপে বসে দুই কাপ কফির অর্ডার দিলাম।

সেই আগে মুখ খুললো। আচ্ছা, কতোক্ষণ আমি তোমার কাধে মাথা রেখেছিলাম?

একটু মিথ্যা বললাম, এই তো মিনিট দশেক হবে।

ডোন্ট টেল এ লাই। তুমি আমার জাগিয়ে দিলে না কেন?

জাগিয়ে দিলে তুমি হয়তো ভাবতে, হৃদয় বলে আমার কিছু নেই। তাছাড়া তোমার মতো সুন্দরী... কথা শেষ করলাম না। তাকে বললাম, চলো, বাস ছেড়ে দেবে হয়তো।

কিছু পটাটো চিপস কিনে নিয়ে নির্দিষ্ট আসনে গিয়ে বসলাম।

হঠাৎ সে বলে উঠলো, আমাদের মধ্যে পরিচয় পর্বটা এখনো হয়নি। আমি লি হুই বেন। কুয়ালা লামপুর এক কলেজে হোটেল ম্যানেজমেন্ট ডিপ্লোমা করছি। পেনাং আমাদের বাড়ি।

আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, তুমি?

ভাবছিলাম ইনডিয়ান বংশোদ্ভূত মালয়শিয়ান বলে চালিয়ে দিই। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়লো, *জন্মভূমি* কবিতার কবি আবদুল হাকিমের কথা।

আমি মনিরুল ইসলাম। সহজে মনির। ফ্রম বাংলাদেশ।

ওকে, ওকে, নাইস টু সিট ইউ।

আমিও বললাম, থ্যাংক ইউ। আবেগ চেপে রাখতে না পেরে বলেই ফেললাম, মে আই বি ইওর ফ্রেন্ড?

হোয়াই নট? অফ কোর্স।

ভোর পাচটা বাজে। আমাদের বাস গন্তব্যে হাজির প্রায়। আমার মোবাইল ফোনটা নিয়ে বেন একটা কল করলো তার নিজের ফোনে। আমার ফোনটা হাতে দিয়ে বললো, ভেতরে আমার নাম্বারটা আছে, মন চাইলে কল করো। এর মধ্যে বেন তার নিজের মোবাইল নিয়ে কোথায় যেন ফোন করে চায়নিজ ভাষায় হাউ মাউ কিছুক্ষণ করে ফোন রেখে দিয়ে আমাকে বললো, বাবাকে ফোন করেছিলাম। বাসস্ট্যান্ডে আমাকে নিতে আসবে।

বাস থেকে নেমে আমরা দুজনেই এক জায়গায় বসে আছি। তিন চার মিনিটের মধ্যে তার বাবা এসে হাজির। বেন আমাকে বললো, কোথায় যাবে, তোমাকে লিফট দিই।

বললাম, তার প্রয়োজন হবে না। আমার বন্ধু কিছুক্ষণের মধ্যে মোটর সাইকেল নিয়ে আসছে। সো, সি ইউ এগেইন ইন কুয়ালা লামপুর।

ওকে, বাই।

বেন চলে গেল।

পেনাং আইল্যান্ড থেকে ফিরে এসে আবার নিজের কাজে মনোযোগ দিয়েছি। প্রায়ই মন চায় বেনকে ফোন করি। কিন্তু মনে করি, বেন হয়তো অতি উৎসাহী ভাববে। ফোন করা হয় না। পনেরো বিশ দিন পরে এক রাতে হঠাৎ ফোন করেছে বেন। ফোন রিসিভ করা মাত্রই বেন–এর অভিযোগ, এতো সহজে ভুলে গেলে আমাকে?

আমি আত্মপক্ষ সমর্থন করে ফেলি। আসলে খুব কাজের চাপ। তাছাড়াও তোমার ফোন নাম্বার সেভ করতে ভুলে গিয়েছিলাম এবং ডায়াল কল বেশি হওয়াতে তোমার নাম্বার হারিয়ে গেছে। আই অ্যাম সরি। তুমি কেমন আছো? কেমন চলছে তোমার স্টাডি।

ওয়েল। এভরিথিং ওকে মনির, দেখা করতে পারবে?

অবশ্যই, তুমি বললে আরো কিছু করতে পারি। কবে, কখন।

আগামী রবিবার সকাল এগারোটায় মিড ভেলি সিটিতে এসে আমাকে মেসেজ দিও।

এভাবেই বেনের সঙ্গে মিড ভেলি সিটি, কে.এল.সি.সি, কে.এল টাওয়ার, ন্যাশনাল মিউজিয়াম, ন্যাশনাল স্টেডিয়াম। আরো কতো জায়গা বেড়ানো হয়েছে, হয়েছে কতো প্রকার কথা।

বেন একদিন বললো, জানো মনির, বাংলাদেশি সম্পর্কে শুধু নেগেটিভ দিকগুলোই সবার মুখ থেকে শুনি। তোমার সঙ্গে পরিচয় না হলে তোমাদের সম্পর্কে পুরোপুরি কখনোই জানা হতো না। জীবনে যদি কোনোদিন সুযোগ ও সময় পাই তাহলে বাংলাদেশ যাবো।

আমিও বেনকে বলেছি, যদি কখনো আমাদের দেশে যাও তবে অবশ্যই নভেম্বর ডিসেম্বরে যাবে। দেখতে পাবে আমাদের দেশে কতো সুখী মানুষ আছে এবং কতো করুণার পাত্রপাত্রী আছে যারা সর্বদাই কান খাড়া করে থাকে ত্রাণসামগ্রী ও শীত বস্ত্র বিতরণের স্লোগান শোনার জন্য।

বেনকে সঙ্গে করে হাত ধরাধরি করে রাস্তা পার্ক, মিউজিয়ামে বেড়িয়েছি। কখনো কখনো মনে হতো, বেন মনে হয় শুধু আমার। একবার প্রপোজ করে দেখি না। কিন্তু পারি না। ভেবেছি, বেন যদি ভুল বোঝে, বন্ধুত্বকেও প্রত্যাখ্যান করে!

বেন–এর সঙ্গে চলেছি। কিন্তু সে কখনো আমাকে খরচ করতে দিতো না। তার মতামত হচ্ছে তোমরা পরিবার–পরিজন ছেড়ে এখানে এসেছো শুধু দুটো পয়সার জন্য। অতএব কখনো ভুল করেও লাইনচ্যুত হয়ো না। সে আরো বলতো, আমার বাবার দুটো গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি আছে। যতোদূর জানি, সেখানে চল্লিশ পঞ্চাশজন তোমাদের দেশি ছেলে আছে এবং সত্তরজন ইন্দোনেশিয়ান মেয়ে আছে। শুনেছি, ওখানে ছেলেমেয়ে সবাই বেশ আরামেই আছে। তবে কখনো দেখিনি।

এভাবেই প্রায় বছর খানেক কেটে যায়।

একদিন বেন আমাকে ফোন করে জানায়, মনির, শনিবার আমি তোমার ওখানে আসছি।

তুমি এখানে আসবে কেন? আমি ব্যাচেলর মানুষ। একা বাসায় থাকি। তুমি চিনবে না, বরং আমিই রবিবারে তোমার সঙ্গে দেখা করছি।

বেন লাইন কেটে দিল। কলব্যাক করলাম, রিং হয় ধরে না। মেসেজ দিলাম। কোনো উত্তর নেই। বেশ মন খারাপ হলো।

শনিবার বিকাল সাড়ে পাচটা বাজে। বেন কল করেছে। রাগে রিসিভ করলাম না। আবারও কল। রিসিভ করলাম।

মনির, পোর্ট কেলাং এসো তো একটু।

গেলাম পোর্ট কেলাং। গিয়ে দেখি বাসস্ট্যান্ডে দাড়িয়ে আছে বেন। কি আশ্চর্য মেয়ে গো! জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার?

আজ তোমার বাসায় যাবো। তুমি যদি আপত্তি করো তাহলে তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব ভেঙে আমার বাসায় চলে যাবো। এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বললো বেন।

ওকে, তাই হবে। চলো ম্যাকডোনাল্ডসের বার্গার খেয়ে নিই।

খাওয়া শেষে বেন নিজ থেকেই বললো, মনির, আজ তুমি বিল দাও।

বিল পরিশোধ করে আরো কিছু সফট ড্রিংকস নিয়ে বাসার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম বেনকে সঙ্গে নিয়ে।

তাকে একবার জিজ্ঞাসা করলাম, এতো পরে এলে, বাসায় ফিরতে তোমার রাত হয়ে যাবে না?

রাতে বাসায় যাচ্ছি না তো। আজ তোমার বাসাতেই থাকবো।

বেন, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি?

হয়তো বা। বেন–এর সংক্ষিপ্ত উত্তর।

যাহোক, বাসায় এসে বেনের সঙ্গে গল্প করে টিভিতে ছবি দেখে হালকা কিছু খেয়ে যখন ঘুমোতে যাবো তখন আরেক সমস্যাই পড়লাম। রুমে আমার স্রেফ একটা বেড এবং তা সিঙ্গল। শুয়ে পড়লাম বেনকে নিয়ে।

বেন বললো, মনির, তুমি আমার মুখী হয়ে শোবে না।

জো হুকুম মহারানী।

এই, কি বললে?

কই না তো, কিছুই বলিনি।

না, তুমি বলেছো তোমাদের ভাষাতে। আমাকে অনুবাদ করে বোঝাও।

এ কথাটা নিয়েই বেন–এর সঙ্গে জোরাজুরি শুরু হলো। বেন আমার নাক কামড়ে দিল। আর সহ্য করতে পারলাম না। বুকের সঙ্গে চেপে ধরলাম। কমলার কোয়ার মতো ঠোঁট আচ্ছা মতো চুষলাম। বেনও আমার সঙ্গে একাত্ম ঘোষণা করেছে। এখন চলছে বস্ত্র অপসারণের পালা। তাও এক সময় শেষ হলো। এবার বেন–এর সুয়েজ খাল দিয়ে আমার তালের নৌকা ভ্রমণের পালা। ওহ! এ ভ্রমণের মজাই আলাদা। ক্লান্ত অবসন্ন দেহ নিয়ে দুজনেই নেতিয়ে পড়লাম।

আস্তে আস্তে তা যেন আবার লাইফ ফিরে পেল। বেন–এর ফর্শা দেহটাকে চুমুতে লাল করে ফেলেছি। বেনও আমাকে ছাড়েনি, মাথা থেকে পা পর্যন্ত সবখানেই তার চুমুর দাগ লাগিয়ে দিয়েছে। জীবনটা আজ বদলে যাচ্ছে।

আবার শুরু হলো বেন–এর খাল পাড়ি দেয়ার সংগ্রাম। ওই রাতে চারবার সুখের খাল পাড়ি দেয়ার পর পঞ্চমবার যখন পাড়ি দেয়ার প্রস্তুতি চলছে তখন বেন বললো, আর নয়। খুব ব্যথা করছে। তোমার বাসায় যদি কোনো ব্যথার ট্যাবলেট থাকে তো দাও।

সকালে বেনকে নিয়ে কে.এল অনেক ঘোরাঘুরি করে যখন বিদায় নিয়ে বাসায় ফিরবো তখন বেন বললো, মনির জানো, গতকাল তোমার বাসায় গেছি কি জন্যে? আমি পরশুদিন অস্ট্রেলিয়া চলে যাচ্ছি।

আমি নির্বাক হয়ে অপলক তার দিকে তাকিয়ে থাকি। বেন বলে, প্রয়োজন আর জীবনের তাগিদে মানুষ একদিন হয়তো নেপচুনে যেতেও বাধ্য থাকবে। ডোন্ট ওয়ারি। তোমার সঙ্গে আমার চিঠির যোগাযোগ থাকবে।

বেন অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার পর আমার কাছে চিঠি দিতো। এখনো ই–মেইল করে। সে আমাকে বলে, তার সঙ্গে চ্যাট করতে। কিন্তু আমার অপারগতার কারণেই হয় না।

এই তো গত মাসের ই–মেইলে আমাকে লিখেছে, আগে কুইনসল্যান্ডে থাকতো, এখন পশ্চিমের পার্থে আছে।

আমি সব সময় তাকে লিখি, বেন তুমি যেখানেই থাকো, সাধ্যমতো সুখ খুজে নেয়ার চেষ্টা করো।

মালয়শিয়া থেকে
monir212@yahoo.com

শর্ত

– প্রিন্স

আইরিন ছিল আমার ভালোবাসা।

বিকেলগুলো পদ্মার উত্তাল ঢেউ–এর মতো কেটে যাচ্ছিল। কখনো টি–বাধ, কখনো পার্কের বেঞ্চে, কখনো বা শিমলা পার্কের সবুজ ঘাসের ওপর দিয়ে চলছিল আমাদের বাধভাঙা ভালোবাসার প্লাবন।

আমরা দুজনে মিলে গড়েছিলাম রাবার গাছের সাজানো বাগান। হঠাৎ আমার সেই বাগান ভেঙে তছনছ করে দিল পাসপোর্ট নামের কালবৈশাখির ঝড়। ঢাকা থেকে আমার মামা আমার জন্য ভিসা, পাসপোর্ট, বিমান টিকেট বুকিং করে এনেছেন। সামনের সপ্তাহে আমার ফ্লাইট।

ঢাকায় এসে নির্ধারিত দিনে শাদা হরিণীর দেশ সিংগাপুরের উদ্দেশ্যে প্লেনে উঠলাম। ব্যস্ততার জন্য আইরিনের সঙ্গে দেখা করে আসতে পারিনি। সিংগাপুরে পৌছেই আইরিনকে চিঠি লিখলাম। জানালাম আমার সীমাবদ্ধতার কথা। সঙ্গে এক বছরের জন্য সময় চাইলাম। এক বছর পর ফেরত এসেই আমার ঘরে তাকে তুলবো আশ্বাস দিলাম।

সিংগাপুরে বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মাঝে এক জুয়েলারি দোকানে সেলসম্যানের কাজ পেলাম। তিন মাস পর ভিসা সংক্রান্ত জটিলতার কারণে পুলিশের ভ্যানে চড়তে হলো। তারপর অন্ধকার ঘরে থাকলাম প্রায় দুই মাস। কোনো একদিন জিয়া ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে নামলাম সম্পূর্ণ রিক্ত হাতে, সিক্ত চোখে।

রাজশাহী এসে বিয়ে নামের শব্দটি খোলসের মতো হৃদয়কেও শূন্য করে দিল।

আইরিনের বিয়ে হয়েছে আমারই দূরসম্পর্কের এক চাচার সঙ্গে। চাচা পরহেজগার মানুষ। তবলিগ থেকে ঘুরে এসেছেন। মুখে দাড়ি, মাথায় টুপি, গায়ে সুন্নতি লেবাস। চাচা থাকেন শান্তাহারে। মুখ ফুটে কাউকে কিছু বলতে পারলাম না। ভেতরের আগুন ভেতরেই চাপা রাখলাম। বাংলাদেশ রেলওয়েতে একটি ছোট চাকরি পেলাম।

প্রথম জয়েন করতে হবে শান্তাহার স্টেশনে। মায়ের অনুরোধে শান্তাহার গিয়ে প্রথমে চাচার বাসাতেই উঠলাম। আইরিনের সামনে দাড়াতে পারলাম না। রাতে পাশাপাশি রুমে শোয়ার ব্যবস্থা হলো।

গভীর রাতে দরজায় টোকা। দরজা খুলে তাকে দেখলাম নতুন করে। ঘরের ভেতরে এসে সে আমার পাশে গা ঘেষে বসলো। আইরিনের মনে জমে থাকা কথার বরফ গলতে শুরু করলো, ওনাকে আমার পছন্দ হয়নি। তার সঙ্গে কোনোদিন আমি ফৃ হতে পারবো না।

আমি কোনো কথা বলছি না।

আইরিন তার স্বামীর কথা বলতে থাকলো, তিনি থাকেন তার এবাদত নিয়ে। আমার দিকে তার তাকানোর সময় কোথায়?

বললাম, ভাগ্যকে মেনে নেয়ায় বুদ্ধিমতীর কাজ।

তুমি কেমন পুরুষ, ভাগ্যকে বিশ্বাস করো! আমি আর পারছি না। আমাকে এখান থেকে উদ্ধার করো।

তাকে সান্ত্বনার বাণী শোনালাম। চাচার সঙ্গেই বাকি জীবন কাটাতে বললাম।

আশ্চর্যজনকভাবে সে আমাকে একটি শর্ত দিল। তার শর্ত মানলে আমি যা বলবো সে তাই করবে। শর্তটা শুনে আমি আকাশ থেকে পড়লাম। আইরিন তার পেটে আমার ঔরসজাত সন্তান ধারণ করতে চায়। আমি না করলাম। কিন্তু সে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। আমাকে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিল। আমিও এক সময় প্রবৃত্ত হলাম।

আমি আস্তে আস্তে আইরিনের ব্লাউজ, ব্রা খুললাম। দেখলাম বিধাতার অপূর্ব সৃষ্টি যেন ভোরের দুটো ফুটন্ত লাল গোলাপ। আইরিনকে পুরো বিবস্ত্র করলাম। তাকে পুরো দুমড়ে-মুচড়ে শেষ করতে ইচ্ছা হলো।

এক সময় দুটো প্রাণী নিস্তেজ হয়ে পড়লাম।

তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, চাচা যদি জানতে পারে?

সে বললো, আমি ম্যানেজ করে নেবো। এভাবে প্রত্যেক রাতে দুটি প্রাণী মেতে উঠতো আদিম খেলায়।

কিছুদিন পর আইরিন সন্তানসম্ভবা হলো।

আইরিনের ছেলে প্রবাস এখন আমার সামনে ঘোরে। প্রবাসকে দেখে মাঝে মধ্যে মনে হয় সম্পদ, প্রতিপত্তি, সম্মান, ভালোবাসা সব কিছু কেড়ে নিলেও প্রবাসী জীবন আমাকে কিছু তো একটা দিয়েছে। এটাই তো আমার পরম পাওয়া।

রাজশাহী থেকে

সিংগাপুরের মশা

– জাহিদ ইকবাল

সিংগাপুরে আছি বেশ কয়েক বছর যাবৎ। বৈধ নয়, অবৈধভাবেই আছি। কিন্তু কেমন আছি, কি করছি, কেমন থাকছি তা আমিই জানি এবং জানে আমার মতো যারা এ পথের পথিক। সিংগাপুরে অবৈধভাবে থেকে কাজ করা যে কতোটা রাফ অ্যান্ড টাফ তা ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। তারপরও আমরা আসি, আসতে হয় পরিবারের জন্য, নিজের ভবিষ্যতের কথা ভেবে। বরণ করে নিতে হয় সিংগাপুরের শত দুঃখ কষ্টকে, মানবেতর জীবনকেও ধীরে ধীরে সহনীয় করে তুলতে হয়।

ঢাকায় থাকা অবস্থায় নিয়মিত ডায়রি লেখার অভ্যাস থাকলেও সিংগাপুরে তা বিভিন্ন কারণে নিয়মিত লেখা হয়ে ওঠেনি। তবে আমার বেশ কিছু দুঃখের কথা ডায়রিতে অতি সংগোপনে তুলে রেখেছি। যায়যায়দিনে প্রবাসীদের নিয়ে লেখা আহবান দেখে তার আর সংগোপনে নয়, ইচ্ছে করলো তার মাঝ থেকে অনন্য একটি ছড়িয়ে দিতে লাখ লাখ পাঠকের মাঝে।

আমি তখন UBI-তে কাজ করি একটি রেস্টুরেন্টে। খুবই লম্বা ডিউটি। সকাল সাতটা থেকে রাত এগারোটা। এরপর দুটো পার্টটাইম। তা সারতে রাত আড়াইটা বাজতো। রেস্টুরেন্টে খাবার ও থাকা ফ্রি ছিল বলে পার্টটাইম করেই ঘুমিয়ে পড়তাম। কেননা সকালে আবার সেই কাজ এবং কাজ জীবনটাকে যান্ত্রিক মনে হলেও মাসের শেষে যখন মোটা অংকের ডলার গুণতাম, নাকের কাছে ডলার নিয়ে তার ঘ্রাণ শুকতাম তখন ভুলে যেতাম আমার পরিশ্রম, ক্লান্তি এবং অবসাদের কথা। এভাবে প্রচণ্ড ব্যস্ততায় বেশ ভালোভাবে যখন কাটছিল দিনরাত তখন হুট করেই মালিকপক্ষ আমার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তলব করে।

আমি তা দিতে অপারগতা প্রকাশ করলে ওই দিন ওই মুহূর্তেই আমার পাওনা ডলার দিয়ে মালিকপক্ষ *সরি* বলে আমাকে নির্দয়ভাবে তাড়িয়ে দেয়। আমার জীবনে আচমকা নেমে এলো দুর্গতি, অমানিশার অন্ধকার। কি করবো, কোথায় যাবো! থাকবো কোথায়, পরিচিত কেউ নেই যে, অন্তত কোথাও গিয়ে রাতটা কাটানো যাবে। এদিকে সেই কখন সন্ধ্যা ঘনিয়েছে! ঘড়িতে চোখ বুলিয়ে দেখি প্রায় দশটা। কিন্তু এখন কি করি, যাই কোথায়!

এর আগে লোকমুখে শুনেছিলাম, আমার মতো যারা অবৈধভাবে সিংগাপুরে রয়েছে, যাদের থাকার জায়গা নেই তাদের অনেকেই নাকি পরিত্যক্ত ভবনে, হাইওয়ে বৃজের নিচে, জঙ্গলে, কেউ বা পুলিশের ভয় উপেক্ষা করে ব্লকের নিচে ঘুমায়। কিন্তু আমি কি করি! আমি যে এ পথে নবাগত। পুলিশের ভয় মাথায় নিয়েই অল্প বিস্তর বৃষ্টিতে কাকভেজা হয়ে Kallang Bahru রোডের JTC বিল্ডিংয়ে উপস্থিত হই। তখন রাত এগারোটা ছাড়িয়ে গেছে। বিল্ডিংয়ের ভেতর বেশ কিছুক্ষণ সিকিউরিটি গার্ডের চোখকে ফাকি দিয়েও থাকার জন্য একটু নিরাপদ আশ্রয় খুজে বের করতে না পেরে এমনি অসহায়বোধ করি যে, দুই চোখের পানিতে আমার চারপাশ ঝাপসা হয়ে আসে।

আম্মাকে খুব করে তখন মনে পড়েছিল। আম্মার আদর সোহাগ যতোই মনে পড়ছিল ততোই আমার দুই চোখ জানি না কেন কেদে কেদে অস্থির একাকার হচ্ছিল। দাড়াতে পারছিলাম না। ক্লান্ত শরীর, ঘুমে দুই চোখ ঢুলু ঢুলু করছিল।

অবশেষে ওই বিল্ডিংয়ের একটু নিচে হেটে আসতেই দেখি স্বল্প ঘন জঙ্গল। তার পাশে পরিত্যক্ত একটি ইটের স্তূপ। পাশেই হাইওয়ের জমকালো লাইটের আলোতে জায়গাটিতে কেমন যেন রহস্যময় আর ভৌতিক মনে হচ্ছিল। আমার অসহায়ত্ব আর সমূহ বিপদ মন থেকে ভয়কে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিল। তাই সাতপাচ না ভেবেই আমার একমাত্র সঙ্গী ও সম্বল ব্যাগটাকে মাথার নিচে দিয়ে ইটের স্তূপের পাশে শুয়ে পড়লাম। বৃষ্টিস্নাত ঘাসের স্পর্শে শরীর নিচ থেকে ভিজে উঠতে লাগলো। কানের কাছে অন্য রকম গুঞ্জন শুনতে পেলাম। মশার গুঞ্জন। মশা আর কাকে বলে! হাজারও মশার ঝাক আমায় ঝেকে ধরলো যেমন মৌচাককে ঝেকে ধরে মৌমাছি। তেলে ভাজা কই মাছের মতো ছটফট, লাফালাফি করছি। সে সঙ্গে দুই হাতে মশা কেচে কেচে ফেলছি।

স্টটলাইটের আবছা আলোতে আমার দুই হাতে শুধু দেখতে পেলাম রক্ত এবং রক্ত। অসহ্য যন্ত্রণায় শোয়া থেকে উঠে বসলাম। সারা রাত কি আর ঘুমাতে পারি! দুই চোখের জলে সিঙ্গাপুরের পরিত্যক্ত এক জায়গায় জঙ্গলে ভোরের অপেক্ষায় থাকি। মশা আমায় ছাড়তে চায় না। অবশেষে রাত হলো ভোর। শরীরের এ দিক–সেদিক হাত দিয়ে বুঝতে পারলাম মশা আক্রান্ত জায়গাগুলো প্রচণ্ড ব্যথায় ফুলে উঠেছে। অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। জানি না এ মশার নাম কি?

আকারে খুব বেশি বড় নয়, তবুও এর কামড়ে ক্ষতস্থান যে কি পরিমাণে ফুলে উঠে এবং এর বিষক্রিয়া কেমন মরণঘাতী হয় তা সুদীর্ঘ আঠারো দিন অমানুষিক যন্ত্রণায় ভুগে বুঝেছি। সে সঙ্গে বুঝেছি সিংগাপুরে অবৈধভাবে থাকার জ্বালা যে কেমন জ্বলন্ত। আমার জীবন এখানে এ অবস্থায় বিপন্ন ছিল। ছিল মৃত্যুর মুখোমুখি। জীবন যুদ্ধে লড়তে এসে এভাবে মরতে গিয়েও বেচে গিয়েছি। আজও আমার কাছে অবাক বিস্ময়!

আমার যদি তখন কিছু হতো, আমি মারা যেতাম, জানি আমার লাশটাও ঢাকায় আমার আম্মা শেষবারের মতো দেখতে পেতেন না। প্রিয় ছোট বোন রুমা আর বায়না ধরে বলতে পারতো না, বড়ভাইজান, আপনি কবে আসবেন? একটা ভাবীর জন্য কতো যে শখ আমার!

আজ আমি বেচে অছি এ আমার গর্ব। কাজ করছি, জীবনও গড়ছি। তবে সেদিনের রাতের পর থেকে জীবন রক্ষাকারী হিসেবে যাকে আমার সঙ্গে সব সময় সঙ্গে রাখি সে হচ্ছে পরম বন্ধুসম একটি মশারি। মশারি নামের বস্তুটির সঙ্গে আজ আমার নিত্যমিতালী যে আমাকে আজ হরহামেশাই হাইওয়ে বৃজের নিচে জঙ্গলে পরিত্যক্ত ভবনে পরম নিরাপত্তা দিয়ে ঢেকে রাখে এবং রাখছে। সে সঙ্গে সিংগাপুরিয়ান ডলার উপার্জনে সহায়তা করছে।

সিংগাপুর সিটি থেকে

এলটন জনের কনসার্টে

– শরীফুল ইসলাম রনী

বিএ পাস করে বেকারত্বের গ্লানিতে ভুগছি। চাকরির জন্য ইন্টারভিউ দিচ্ছি। মাঝে মধ্যে লিখিত পরীক্ষায় পাস করছি। কিন্তু মৌখিক পরীক্ষায় বাদ পড়ছি। মজদুর শ্রমিক ছাড়া অন্য কোনো কাজ জোটাতে পারছি না। একটা অফিশিয়াল কেরানির চাকরির জন্য যে কতো জায়গায় ঘুরেছি তার ইয়ত্তা নেই। পুলিশ সার্জেন্ট পদে চাকরির জন্য লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও চাকরি পেলাম না। ওরা ঘুস চায়। টাকার অংকটা এতো বেশি যে, আমার গরিব পিতা কখনো এতোগুলো টাকা এক সঙ্গে দেখেননি।

এরপর বেকার জীবনের অবসানের জন্য ১৯৯৯ সালে চাকরি নিয়ে মালয়শিয়ায় আসি। তিন বছর মেয়াদে মালাক্কাতে *মাম্মি প্যাসিফিক ফুড প্রোডাক্টস লিমিটেড*–এ শ্রমিক হিসেবে যোগ দিই। কম্পানি প্রতিদিন চোদ্দ রিংগিট হিসেবে মাস শেষে বেতন দেবে এবং উন্নত মানের থাকা ও খাবারের ব্যবস্থা করবে। এ রকম জেনেই দেশ ছেড়েছি। কিন্তু এখানে এসে দেখি কম্পানির আগের প্রতিশ্রুতির সঙ্গে কোনো মিল নেই। এখানে কম্পানির খুবই নিম্নমানের আবাসন ব্যবস্থা যেখানে প্রতিটি রুমে সাত থেকে দশজন পর্যন্ত একত্রে চাপাচাপি করে ফ্লোরে ঘুমাতে হয়। আর খাবার ব্যবস্থা হলো, দু বেলা শুকনো রুটির সঙ্গে এক মগ চা এবং এক বেলা ভাত, সঙ্গে এক পিস মাছ ভাজা।

পুরনো শ্রমিকের কাছ থেকে জেনেছি, কম্পানির খাবার রুটিনে কোনো পরিবর্তন আসবে না। তাদের অনেকেই দুই বছর কিংবা কেউ কেউ এক বছর ধরে এখানে কাজ করছেন। আমার ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছে, দাতে দাত চেপে সব কিছু সহ্য করি। কেননা এ দেশে এসেছি বাবার সর্বস্ব বিক্রি করে।

আরেক দফায় প্রতারিত হলাম মাস শেষে বেতন আনতে গিয়ে। প্রতিদিন চোদ্দ রিংগিট করে চারশ বিশ রিংগিট–এর স্থলে আমাকে দেয়া হলো প্রতিদিন নয় রিংগিট হিসেবে দুইশ সত্তর রিংগিট। বেতন কম দেয়ার কারণ জানতে চাইলে কম্পানি থেকে বলা হলো, আমিসহ সব শ্রমিকের কাছ থেকে প্রতি মাসে একশ পঞ্চাশ রিংগিট পাবে এজেন্সি যাদের মাধ্যমে আমরা এ দেশে এসেছি। কিন্তু মালয়শিয়ায়

আসার আগে এজেন্সির পক্ষ থেকে আমাদেরকে এমনটি বলা হয়নি। তাহলে হয়তো আমি কিংবা অনেকেই দেশ ছেড়ে এ দেশে আসতো না। এভাবেই এখানে এক বছর কাটিয়ে দিই।

গত এক বছর ধরে এখানে কাজ করে তিক্ত, বিরক্ত হয়ে উঠেছি। প্রায়ই মনে হয় দেশে ফিরে আসি। কিন্তু সেটা তো হবার নয়। কারণ আমার পাসপোর্ট, ভিসাসহ সব কাগজপত্র কম্পানির জিম্মায়। শর্ত অনুযায়ী কম্পানির পুরো তিন বছর মেয়াদ পার হওয়ার আগে দেশে ফেরা অসম্ভব। হঠাৎ করেই আমাকে এক ঝিলিক আশার আলো দেখায় লিটন নামে একজন। সে বাংলাদেশের নরসিংদী থেকে এসেছে। মালয়শিয়ান পাসপোর্ট অফিসের সঙ্গে তার ভালো যোগাযোগ আছে। মাত্র দুই হাজার রিংগিট–এ সে নতুন পিসি পাসপোর্ট করে দিতে পারে। ফলে সেই পাসপোর্ট–এর বলে যে কেউ স্বাধীনভাবে পুরো মালয়শিয়ায় কাজ করতে পারবে।

লিটনকে বিশ্বাস করে পুরো দুই হাজার রিংগিট ওর হাতে তুলে দিই। গত এক বছরের রোজগার থেকে বাবাকে কিছুই দিতে পারিনি। তবুও উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাবার আশায় আমার বর্তমান কম্পানি ছেড়ে পালিয়ে লিটন–এর সঙ্গে কুয়ালা লামপুরে চলে আসি। এখানে নিউ মার্ভেস্থা হোটেলে এক রাত থেকে পোলাও পিনেং চলে আসি। সে আমাকে হোটেল *সি ভিউ বিচ হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্টে* কাজ জুটিয়ে দেয় এবং নতুন পাসপোর্ট দিয়ে যায়।

এখানে মাস খানেক কাজ করার পর একদিন *ম্যাডেকা* স্টেডিয়ামে পপগায়ক এলটন জন–এর লাইভ কনসার্টে যাই। কনসার্ট থেকে ফেরার সময় পুলিশ চেকিংয়ে আমার পাসপোর্টকে অবৈধ বা জাল ঘোষণা করা হয়। গ্রেফতার হই। পুলিশ আমাকে জেলে পাঠিয়ে দেয়, খুব মারধর করে। এখানে বাংলাদেশি দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে সাহায্য চাই। কিন্তু কোনো সাড়া না পেয়ে বাংলাদেশে বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করি।

বাবা আমাকে ফিরে আসার জন্য প্লেনের টিকেট খরচ পাঠালে ফিরে আসি। জেলে ছিলাম মোট সতেরো দিন। এই সময়ে পুলিশি নির্যাতনের ছাপ এখনো আমার শরীরে অটুট রয়েছে। জেলে বন্দী অবস্থায় আরো প্রায় দুইশ বাংলাদেশিকে দেখেছি যারা দেশে ফেরার প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছে যদি তাদের স্বজনরা বাংলাদেশে ফেরার ব্যবস্থা করেন তবেই প্রতীক্ষার অবসান। কিন্তু মালয়শিয়ান পুলিশরা যে রকম নির্দয়ভাবে মারধর করে তাতে একজন লোক খুব বেশি দিন বাচতে পারবে না। এটা অকল্পনীয় ব্যাপার।

তবে মাঝে মাঝে ভাবি সেদিন যদি এলটন জনের কনসার্টে না যেতাম তাহলে আজো হয়তো মালয়শিয়াতেই থাকতাম।

ধামরাই, ঢাকা থেকে

লরেন

–ইমরুল কায়েস

আমার বন্ধু রিপন থাকে আমেরিকা গত পাচ বছর ধরে। দেশে এলে তার সঙ্গে সে দেশের অনেক কথা হয়। গত এক বছরে সে আমাকে অনেকগুলো চিঠি দিয়েছে।

বছর দুয়েক আগের চিঠিতে সে লিখেছিল, সে আমেরিকার এক তরুণীকে ভালোবেসেছে। মেয়েটির কাছে সে বাংলাদেশের অনেক গল্প করে। সে বাংলাদেশে আসার ইচ্ছা পোষণ করেছে।
এরপরের চিঠিতে বন্ধুটি লিখেছে, লরেন নামের মেয়েটির সঙ্গে তার সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হয়েছে। বর্তমানে তারা একই প্রতিষ্ঠান কাজ করে। সামনের ছুটিতে তারা দুজনেই বাংলাদেশে আসছে।
শেষ চিঠিতে বন্ধুর করুণ বাণী প্রকাশিত হয়েছে। বলছে, সে একাই দেশে আসছে। লরেন আসছে না। কারণ টাইম ম্যাগাজিনে আলেক্স পেরির লেখা দেখে সে বাংলাদেশে আসতে ভয় পাচ্ছে।
কিছুদিন পরে হয়তো আমার বন্ধুটি এ দেশে আসবে। কিন্তু তার পাশে সেই মিষ্টি মেয়ে লরেনকে দেখবো না আর এর জন্য বেশি দায়ী সাবেক প্রধানমন্ত্রী হাসিনা।

মিরপুর, ঢাকা থেকে

একাকী

–মাসুম

প্রেম ভালোবাসা স্বর্গীয় ব্যাপার। প্রেম ভালোবাসা কখন কিভাবে হয়ে যায় বলা যায় না। তবে এর আগমন উপলব্ধি করা যায়। প্রথমে কাউকে ভালোলাগতে শুরু করে তারপর আস্তে আস্তে সেই ভালোলাগা থেকেই ভালোবাসার জন্ম হয় মনের মধ্যে। আমার জীবনেও কয়েকবার প্রেম এসেছিল। আমি এখন আপনাদেরকে আমার প্রেমের রাজ্যে নিয়ে যাবো। চলুন তাহলে। তবে আপনাদের বিচারে আমি দোষী হলে নিজগুণে আমাকে ক্ষমা করে দেবেন।
ছোটবেলা থেকেই ইচড়ে পাকা টাইপের ছিলাম। তাই তো ক্লাস ফাইভে পড়ার সময়ই একই ক্লাসের শাহনাজের প্রেমে পড়েছিলাম। কিন্তু তাকে বলতে পারিনি ভয়ে যদি স্যারকে বলে দেয়! তারপরের বছর অর্থাৎ ১৯৮৫ সালে অন্য স্কুলে ভর্তি হলে ওই একপক্ষীয় প্রেমের ওখানেই সমাপ্তি ঘটে।
১৯৮৯ সালে ম্যাট্রিক পাস করে কলেজে ভর্তি হয়ে এক বছরের মাথায় পান্নার প্রেমে পড়ে যাই। এই প্রেমটি ছিল বৃটেনের সংবিধানের মতো অলিখিত। কারণ অনুভব করতাম তাকে ভালোবাসি এবং সেও যে আমাকে ভালোবাসতো তাও বুঝতাম। কিন্তু কেউ কাউকে বলিনি যে, আমি তোমাকে ভালোবাসি।
প্রতিদিন কলেজের শহীদ মিনারে তার সঙ্গে আড্ডা না দিলে ভালোলাগতো না। সেও কলেজে এসেই সরাসরি শহীদ মিনারে চলে আসতো। একজন আরেকজনকে না দেখে থাকতে পারতাম না। সে যদি কলেজে না আসতো তাহলে সন্ধ্যায় তাদের বাসায় চলে যেতাম।
পান্নার আব্বা–আম্মা বিষয়টি বুঝতেন। কিন্তু এ ব্যাপারে তাদের কোনো আপত্তি ছিল না। তার বেশ কয়েকজন ছোট বোন ছিল তাদের কোনো ভাই ছিল না। তাই তারা সবাই আমাকে বড় ভাইয়ের মতোই দেখতো এবং আমিও সাধ্যমতো চেষ্টা করতাম ভাইয়ের আদর দিতে। আমার বন্ধু–বান্ধব থেকে শুরু করে কলেজের সকলেই জানতো আমাদের সম্পর্কের কথা।

একদিন কলেজের দুই তিনজন স্যার মিলে আব্বার কাছে আমার নামে নালিশ দিলেন যে, আমি ক্লাস করি না। সারাক্ষণ শুধু পান্নাকে নিয়ে আড্ডা দিই। তারপর তো আমার সে কি অবস্থা!

আমরা একজন আরেকজনকে খুব ভালোবাসতাম। তাই তো কখনো মনে হয়নি বলতে হবে ভালোবাসি তোমাকে, শুধুই তোমাকে।

পান্না যদি কখনো আমার ওপর রাগ করতো তাহলে আমার মনের মধ্যে যে ড্রামের আওয়াজ পেতাম কিংবা আমি তার ওপর রাগ করলে দুই একদিন তার না খেয়ে থাকা থেকে কি বোঝা যায় না, আমরা একে অপরকে কতোটুকু ভালোবাসি! এভাবেই আমাদের দিন, মাস, বছরগুলো গড়িয়ে যাচ্ছিল।

১৯৯৬ সালে জুনের নির্বাচন নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলাম। হঠাৎ করেই সে আমার কাছে সংবাদ পাঠালো, যেভাবেই হোক আমি যেন তার সঙ্গে দেখা করি। সংবাদ পেয়েই তার কাছে ছুটে গেলাম। সে আমাকে যা বললো তার সারমর্ম হচ্ছে, তার পরিবার থেকে তার জন্য পাত্র দেখেছে। সে পাত্রের সঙ্গে ফোনে আমার ব্যাপারে কথাও বলেছে কিন্তু তাতেও পাত্রের কোনো আপত্তি নেই। এমনকি পান্না যা চায় তা করতে বা দিতে রাজি আছে পাত্র।

সে আমাকে এসব বলে কাদছিল এবং আমার মতামত চাইছিল। আরো কিছুক্ষণ তার সঙ্গে আলাপ করে বুঝতে পেরেছিলাম। আমি যদি ওই মুহূর্তে বিয়ে না করি তাহলে সে এই পাত্রকে হাতছাড়া করতে নারাজ। আমার ওই মুহূর্তে বিয়ে করা সম্ভব ছিল না। কারণ তখন হানড্রেড পার্সেন্ট বেকার এবং গাছ তলায় থেকে দুইবেলা দুমুঠো খেয়ে জীবন কাটিয়ে দেবো এমন কথায় বিশ্বাসী ছিলাম না। তাই তো সেদিন আমার সীতাকে বিসর্জন দিয়েছিলাম দুই কলকি খেয়ে। কোনো নেশাখোর ছিলাম না। কিন্তু সেদিন নেশা করে ছিলাম। নির্বাচনের দুই সপ্তাহ পর পান্না অন্যের ঘরের বৌ হয়ে চলে যায়।

নির্বাচনে বিএনপি হেরে যাওয়ার পর খুব ভেঙে পড়েছিলাম। জীবনের হিসাব মেলাতে পারছিলাম না কি করবো! শেষে সিদ্ধান্ত নিলাম বিদেশ চলে যাবো। আদমদের পেছনে ঘুরতে ঘুরতে প্রায় দুই বছর শেষ করে ফেলেছি। কিন্তু কোনো ব্যবস্থাই করতে পারছিলাম না। এ কারণেই বেকার জীবনের প্রতি ঘৃণা আসতে শুরু করেছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে আমার জীবনে লীনার আগমন। প্রথম যেদিন বন্ধুর বাসায় তার সঙ্গে কথা বলি সেদিন আমার হাত ধরে বলেছিল, এই হাত তুমি দূরে ঠেলে দিও না, সারা জীবন এভাবেই আগলিয়ে রেখো।

আমিও তাকে কথা দিয়েছিলাম।

ছন্নছাড়া জীবনে তাকে পেয়ে আবার নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলাম। আমাদের দিনগুলো ভালোই কাটছিল। এর মধ্যেই একদিন আমার আদম খবর পাঠালো আগামী সপ্তাহে ফ্লাইট। একদিকে লীনাকে ছেড়ে চলে যেতে হবে, অন্যদিকে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার হাতছানি। এই খবর শুনে কষ্টও পাচ্ছিলাম আবার নিজের ভবিষ্যতের কথা ভেবে খুশিও হয়েছিলাম।

বন্ধু সাঈদ আমার বিদেশ চলে যাওয়ার খবর শুনে আমাকে বলেছিল, এই মাল তুমি খেয়ে যাও বন্ধু না হলে দেশে ফিরে আর পাবে না। কারণ লীনার ছিল খুব সুন্দর শারীরিক গঠন। উচ্চতায় পাচ ফিট তিন ইঞ্চি। গায়ের রঙ ফর্শা, ব্রেস্ট চৌত্রিশ, চোখগুলো ছিল মায়াবী।

আমি ভোগবাদী ছিলাম না। তাই তো আমার প্রেমকে পবিত্র রেখে সিংগাপুর চলে আসি। চলে আসার সময় লীনা আমাকে জড়িয়ে ধরে খুব কেদেছিল এবং বলেছিল, আমার জন্য অপেক্ষা করবে দেশে ফিরে না আসা পর্যন্ত। কিন্তু লীনা কথা রাখেনি।

সে আমার কাছে একটি চিঠিও দেয়নি, এমনকি এক বছরের মাথায় খবর পেলাম সে বিয়ে করে অন্যের ঘরনী হয়েছে।

বন্ধু সাঈদ দক্ষিণ কোরিয়া থেকে প্রায়ই আমাকে ধাক্কা দেয় এবং বলে, আগেই বলেছিলাম দোস্ত, মালটা খেয়ে যাও। কিন্তু তুমি মানলে না। এখন দেখলে তো তোমার পরান পাখি উড়াল দিয়েছে।

প্রথম প্রথম খুব খারাপ লাগতো তার কথা মনে হলে। তারপর নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা দিতাম, আমি তো তার সঙ্গে প্রতারণা করিনি বরং আমি প্রতারিত হয়েছি আমার ভালোবাসার কাছ থেকে।

এখানে এসে কাজ করতে করতে খুব বোরিং ফিল করতাম। মাঝে মধ্যে নিজেকে খুব নিঃসঙ্গ মনে হতো। একদিন কাজ করছি হঠাৎ দূর থেকে কানে ভেসে এলো মেয়েলি কণ্ঠে আসসালামু আলাইকুম শব্দ। পাশ ফিরে দেখি তিন চার বাসা দূরে এক দোতলার বারান্দায় দাড়িয়ে আছে দুইজন ইন্দোনেশিয়ান মেয়ে। একজনের বয়স হবে পচিশ ছাব্বিশ, অন্যজনের পয়ত্রিশ ছত্রিশ। বয়স্ক মহিলাটি ইশারায় আমাকে বোঝাতে সক্ষম হলেন যে, ওই মেয়েটি আমাকে পছন্দ করে।

তারপর শুরু হয় চিঠি দেয়া-নেয়া এবং ফোনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলাপ। সময় পেলেই তাদের বাসায় ফোন করতাম। এভাবেই দিনের পর দিন আমাদের সম্পর্ক গভীর হতে থাকে। তার নাম ছিল এনডাং সুপৃহাতিন।

প্রতি মাসে তার একদিন অফ ডে ছিল। তার অফ ডেতে আগের দিনের কথা মতো সকাল দশটায় Navina MRT স্টেশনে তার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। সোয়া দশটায় সে এসে পৌছায়। তারপর এক সঙ্গে সকালের নাশতা সেরে ট্যাকসি নিয়ে হোটেলে চলে যাই। চার ঘণ্টা ছিলাম ওখানে।

এই প্রথম কোনো ভালো মেয়ের সঙ্গে সেক্স করি। সত্যিই চমৎকার ফিলিং। সেদিনই বুঝতে পারি বাজারের জিনিস এবং ঘরের জিনিসের মধ্যে কতো তফাত। সেদিন আমার বুকে মাথা রেখে এনডাং কেদেছিল। জানি না সে কান্না সুখের ছিল, না দুঃখের ছিল।

এরপর থেকে আমরা কয়েকশবার মিলিত হয়েছি। চষে বেরিয়েছি সিংগাপুরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত। আমাকে নিয়ে সে সুখের সাগরে ভেসেছিল।

একদিনের এক ঘটনা। আমার এক মামা সিংগাপুর থেকে দেশে চলে যাবেন শুনে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, তোমার বাবা মায়ের জন্য কি পাঠাচ্ছো।

বলেছিলাম, কিছুই না। কারণ আমার কাছে তখন টাকা ছিল না। সে বিষয়টি বুঝতে পেরে আমাকে জোড়াজুড়ি শুরু করলো তার কাছ থেকে টাকা নেয়ার জন্য। যখন তার কাছ থেকে টাকা নিচ্ছিই না তখন সে আমাকে বললো, ঠিক আছে, তুমি আমার কাছ থেকে ধার হিসেবে নাও, পরে দিয়ে দিও। পরে ফেরত নিতে হবে এই শর্তে তিনশ ডলার ধার নেই।

পরবর্তীকালে শত চেষ্টা করেও টাকা ফেরত দিতে পারিনি। যখন আমি টাকা ফেরত দিতে চাইতাম তখনই সে আমাকে বলতো, তোমার বাবা-মা কি আমার বাবা-মা না, আমার টাকা কি তোমার না

কিংবা তোমার টাকা কি আমার না? তুমি যদি আমাকে টাকা ফেরত দাও তাহলে বুঝবো যে, তুমি আমাকে ভালোবাসো না।

এমনই আরো হাজারও ঘটনা যা কয়েকদিন ধরে লিখেও শেষ করা যাবে না। এনডাংকে খুব ভালোবাসতাম। তাই তো সে ইন্দোনেশিয়া চলে যাবার দেড় বছর পরও একটি দিনের জন্য ভুলতে পারিনি।

পান্না, লীনাকে তো এখন আর মনেই পড়ে না। কিন্তু এনডাংকে মন থেকে দূর করতে পারি না একটি মুহূর্তের জন্যও। মাঝে মধ্যে ইস্ট কোস্ট পার্ক–এ সাগর পাড়ে একাকী বসে যখন পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করি তখন এনডাংয়ের কথা মনে হতেই নিজের অজান্তে চোখের নোনাজল, সাগরের নোনাজলের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যায়।

সিংগাপুর থেকে

অনিশ্চয়তা অশান্তি আর দুশ্চিন্তা

–মোহাম্মদ মাহমুদুল হোসেন হেলাল

বাবা, তোমাকে বিদেশে গিয়ে আমাদের জন্য টাকা পাঠাতে হবে না। কিন্তু তোমাকে একবার বিদেশে যেতেই হবে। এই ছিল আমার মায়ের বিদেশ প্রসঙ্গে আমার উদ্দেশ্যে বক্তব্য।

সেটা ছিল ১৯৯৩ সালের শেষের দিকের কথা। ১৯৯২ সালে বিএ পাস কোর্সের পরীক্ষা সেশন জটের কারণে হলো ১৯৯৩ সালে। ফল প্রকাশিত হলো ১৯৯৪ সালে। এমনিতেই ছিলাম দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, তার উপর আম্মাকে কিছু লোক বোঝালো যে, এক মেয়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক আছে। বিদেশে না পাঠালে এটা ছাড়ানো সম্ভব হবে না। ইতিমধ্যে সেকেন্ড ক্লাসে বিএ পাস করেছি। তার আগে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক যথাক্রমে ফার্স্ট এবং সেকেন্ড ডিভিশনে পাস করেছিলাম। সঙ্গত কারণেই আশা ছিল, দেশেই কিছু একটা করবো, পাশাপাশি এমএ ভর্তি হবো। কিন্তু কিছুতেই আব্বা আম্মাকে বোঝাতে পারলাম না যে, কোনো মেয়ের সঙ্গে এমন কোনো সম্পর্ক আমার নেই।

তাদের দুশ্চিন্তার প্রধান কারণ ছিল, আমার ছোট চাচা প্রেম করে বিয়ে করে আর বাড়িমুখী হননি। আজও তিনি বাড়ি যান অতিথি হয়ে।

শেষ পর্যন্ত তড়িঘড়ি করে ভিসা কিনে জাল পাসপোর্ট বানিয়ে ভালো চাকরি, ভালো বেতন ইত্যাদি বলে আমার এক প্রতিবেশী আমাকে কুয়েতে পাঠায়। কিন্তু কুয়েত এয়ারপোর্টে নামার পর পরই আশাভঙ্গের শুরু।

এখানেই জানতে পারলাম, আমি একটি ক্লিনিং কম্পানিতে ক্লিনার হিসেবে এসেছি। বেতন মাত্র তিনশ দিনার। বহু হতাশা, ঝগড়া–বিবাদ ইত্যাদির মাধ্যমে এ কম্পানিতে সর্বমোট একুশ মাস ছিলাম। এর মাঝেও বহুবার রিজাইন দিয়ে বহুভাবে দেশে আসার চেষ্টা করি। কিন্তু সফল হইনি। কম্পানি আমার বেতন কিছুটা বাড়ায় এবং কিছুটা ভালো অবস্থান পাই।

এ সময়ের মাঝেই মা–বাবাকে আমাকে বিদেশে পাঠানোর পরামর্শদাতা তার সঙ্গে কর্মরত আমার একমাত্র বড় বোনকে বিভিন্নভাবে উত্যক্ত করে সফল না হয়ে বিভিন্ন তাবিজ, কবিরাজি করে পাগল করে দেয়। উল্লেখ্য, আমার এ বোন ছাড়া আর কোনো ভাইবোন নেই। তাই সে তার পথের কাটা সরাতে আমাকে বিদেশে পাঠায়। এক পর্যায়ে দুলাভাইকে আমার বোন তালাক দিয়ে একমাত্র ভাগ্নিকে ছেড়ে দিয়ে তাকে বিয়ে করে। যদিও সে ছিল চার সন্তানের জনক এবং তার বড় মেয়ে তখন এসএসসি পরীক্ষার্থী।

আমাদের সম্পত্তি এবং আপার চাকরির বেতনের লোভেই তার এই অপকর্ম। এই দুঃখ সইতে না পেরে আব্বার স্ট্রোক হয়। চার বছর পক্ষাঘাতগ্রস্ত থেকে অবশেষে মারা যান। আম্মার অবস্থাও এমনি। আমার জীবনের এই বাস্তব ঘটনা চলচ্চিত্রের কাহিনীকেও হার মানায়। লেখার দীর্ঘতার কারণে যথাসম্ভব ছোট করে তুলে ধরার আমার এই প্রয়াস।

প্রবাস জীবনের এই কঠিন এবং জটিল জীবনপ্রবাহ সকালে শুরু হয় আপনজনদের মুখ কল্পনা করে আর রাতে শুতে যায় দীর্ঘশ্বাস সম্বল করে আপনজনদের স্মৃতি রোমন্থন করে। প্রবাসীদের কাছে দেশ থেকে আসা একটি চিঠি তো যেন চিঠি নয়, মনে হয় আপনজনকে বাস্তবে পাওয়া। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায়, সেসব চিঠিতে লেখা থাকে – টাকা নেই, টাকা চাই, ছোট ভাই ঠিকমতো পড়াশোনা করে না অথবা ছোট বোন কারো হাত ধরে চলে গেছে কিংবা সন্তান পড়াশোনা করে না কিংবা কোনো আত্মীয়ের ভিসা চাই ইত্যাদি। তারচেয়েও নির্মম হয়ে ওঠে যখন শুনতে হয়, স্ত্রী অন্যের হাত ধরে চলে গেছে কিংবা যাযাদির প্রকাশিত পুতুলের মতো বা মিতাভাবীর ভাগ্যবরণ করতে হয়।

এ নির্মম সত্যগুলোই আমাদের জীবনসঙ্গী। তারপরও সমাজের প্রতিটি স্তরেই প্রবাসীরা বৈরিতার শিকার। বিয়ের বাজারে মধ্যপ্রাচ্যে চাকরিরত পাত্রদের অবস্থান নিচের দিকে। এয়ারপোর্ট, কাস্টমস এবং দেশের চাদাবাজ, মাস্তানদের কাছেও আমরা নির্মমতার শিকার। কর্মস্থলের কথা কি বলবো! মাঝে মাঝে এমন এমন নিয়োগকর্তা কিংবা কর্মকর্তা মিলে যারা আমাদেরকে মানুষই মনে করে না।

আমি এবার বিশ্বের বর্তমান সময়ের সবচেয়ে আলোচিত, ঘৃণিত, সমালোচিত অ্যাংলো–আমেরিকান জোটের ইরাকে হামলার ব্যাপারে কিছুটা আলোকপাত করবো। একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের ওপর বুশ–ব্লেয়ারের এই নির্লজ্জ হামলা শান্তিপ্রিয় বিশ্ববাসীকে অশান্ত করে তুলেছে। দীর্ঘ প্রায় ছয় মাস থেকে ট্যাংক, অস্ত্র, গোলাবারুদ, কামান, ক্ষেপণাস্ত্র, যুদ্ধ বিমান, ক্ষেপণাস্ত্র বিধ্বংসী কামান ইত্যাদির সমরসজ্জা শুরু হয়। আমার কর্মস্থল আমেরিকানদের সেনানিবাসের সন্নিকটে দোহা ওয়েস্ট পাওয়ার হাউজে। এই লেখাটি পাঠানোর সময় প্রতিদিনই এদের তৎপরতা দেখি, দেখি একটা আরব দেশে এদের নির্লজ্জ বেহায়পনা। সুইমিং পুলে আমেরিকান মহিলা–পুরুষদের নির্বিচারে ব্রা, প্যান্টি পরে শুয়ে থাকতে।

প্রথম যেদিন আমেরিকান জোট ইরাকে হামলা চালায় সেদিন কি যে এক উৎকণ্ঠা, ভয় এবং অস্থিরতার মাঝে আমাদের দিন কেটেছে তা বোঝানো যাবে না। কুয়েতের ওপর প্রথম যে ক্ষেপণাস্ত্র আছড়ে পড়ে তা আমাদের স্টেশনের অনতিদূরেই। সাইরেনের শব্দ, অন্যদিকে ইরাক থেকে ভেসে আসা কালো ধোয়া আমাদের হৃদয় আকাশকেও যেন কালো ধোয়ায় ছেয়ে গেছে। কিভাবে বের হবো কুয়েত থেকে, কোথায় যাবো কিছুই সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না। আবার এদিকে বিমানের ফ্লাইট বন্ধ হয়ে গেছে

কুয়েত থেকে। কুয়েত এয়ারওয়েজসহ অন্য ফ্লাইটগুলোর দাম বেড়ে যায় কয়েকগুণ। পাসপোর্ট রয়ে গেছে কম্পানিতে, কম্পানি দিচ্ছে না। বাড়ি থেকে উদ্বিগ্ন আপনজনদের ফোন।

ইন্টারনেটের বেশ কিছু ফোন, বিশেষত ডিএইচএল-এর লাইন বন্ধ হয়ে যায়। মোবাইলে দেখা দেয় নেটওয়ার্কজনিত সমস্যা। এতোসব অস্থিরতা আর অশান্তি নিয়েও আমরা বেচে আছি। আমাদের বেচে থাকতে হয়।

কুয়েত থেকে

থাই সুন্দরী

–তপন সুদীপ্ত

১৯৯৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর। একটি ফ্যাক্সের দোকান থেকে ফোন পেলাম। গিয়ে দেখি আমার নামে ফ্যাক্স থাইল্যান্ডের এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ টেকনলজিতে (এআইটি) আরবান এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্টে এমএসসি পড়ার জন্য ফুল স্কলারশিপ। জীবনের সবচেয়ে আনন্দদায়ক সংবাদ বলে মনে হলো ফ্যাক্স বার্তাটিকে। পরের বছর ৩ জানুয়ারি থেকে ক্লাসে যোগ দিতে হবে। সরকারি প্রেষণ আদেশ, টিকেট, ভিসার জন্য ছোটাছুটি শুরু হলো।

থাইল্যান্ডের মেয়েদের নিয়ে অনেক মুখরোচক কাহিনী শোনা যায়। এর আগেও তিন মাসের ট্রেনিংয়ে গিয়ে থাই সুন্দরীদের অনেক রঙ্গ-তামাশা দেখিছি। অফিস, দোকান, বাস হোটেলে সুন্দরী থাই মেয়েরা সবখানে কর্মরত। সব সময় হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানাতে তৈরি তারা। পর্যটন এলাকায় মাসাজ পার্লার, গো গো স্টেজ, নাইট শো-তে উপস্থিত না হয়ে নিজেকে সংযত রাখা কঠিন। এবার দুই বছরের জন্য যাচ্ছি সে দেশে।

নিজের বৌটিকে সঙ্গে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। গত মাত্র তিন মাসের চিন্তায় বেচারি শুকিয়ে অর্ধেক হয়ে গিয়েছিল। এবার ওকে সঙ্গে নিতেই হবে। যাই এমবাসিতে। দুই কন্যাকে সঙ্গে দিয়ে পাসপোর্টসহ তাকে দাড় করিয়ে দিয়ে আমি সচিবালয়ে জিও তদবিরে ব্যস্ত ছিলাম।

বিকেলে বৌ বেচারি মন খারাপ করে ফোন করলো। আমার ভিসা হয়েছে, ওরটা হয়নি বলে দিয়েছে। বললাম, চিন্তা করো না, পরদিন ভিসার জন্য আবার লাইনে দাড়িয়ে যাও। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্যাচমেট এক বন্ধুকে দিয়ে ভিসা অফিসারের কাছে ফোন করালাম। বাংলাদেশি এক মহিলাকে বললাম, দুই বছর ব্যাংককে বৌ ছাড়া থাকার কষ্ট আপনি বোঝেন? খুব বেশি ব্যাখ্যা করে বলতে হয়নি।

বললো, স্যার আমি গ্রাটিস ভিসা দিয়ে দিচ্ছি।

মেয়েটিকে ধন্যবাদ জানালাম দুইজনে।

বাংলাদেশ বিমানে ব্যাংকক এয়ারপোর্টে নামলাম সন্ধ্যার একটু আগে। রাস্তাঘাট আগেই চেনা ছিল। অনেক কসরত করার পর এআইটির একটি রুমে ঠাই করে নিলাম। থাই মুসলিম রমণী পরিচালিত হোটেলে ভাত ও ঝালমুরগি খেয়ে কয়েকদিন চালিয়ে দিলাম।

ইয়াসমিন ছোটখাটো ফিগারের ফর্শা সুন্দরী। একটি টি-শার্ট ও হাফপ্যান্ট পরে ঘুরে বেড়ায়। তার কয়েকজন মেয়ে হোটেলটি চালায়। তার সঙ্গে আগেই পরিচয় ছিল। এবার আরো বেশি জমে উঠলো। তার বোন বিয়ে করেছে এক পাকিস্তানি ছাত্রকে। সে কেন বিয়ে করেনি তা জানা গেল না। ভালো ইংরেজি বলতে পারে। তার কাছ থেকে কিছু থাই ভাষা শিখে নিয়েছি দোকানপাটে কাজে লাগানোর জন্য।

এআইটি-র একটু দূরেই *তালাত থাই* অর্থাৎ থাই বাজার। উত্তরা-অঞ্চলের যতো তরকারি, ফলমূল এ আড়তে এসে শহরে ঢোকার ব্যবস্থা হয়। পাইকারি কিনতে গেলে খুব শস্তা, প্রণতি সহ দুই কন্যা কণা-সনা প্রতি সপ্তাহে দুই তিনদিন মাছ-মাংস, ফলমূল প্রচুর কিনেছি।

থাইল্যান্ডকে বলা হয় ল্যান্ড অফ স্মাইল অর্থাৎ *স্মিত হাসির দেশ*। সত্যি বলতে কি, প্রতিটি দোকানপাটে থাই মেয়েরা সেজেগুজে বসে এবং সবাইকে একটি স্মিত হাসি উপহার দিয়ে কোমল কণ্ঠে অভ্যর্থনা জানাতে এদের জুড়ি নেই। সুন্দরী সাজগোজ করা মাছ বিক্রেতা মেয়েদের দেখিয়ে বৌকে বলেছি, এদের একজনকে বিয়ে করে সারা বছর বিয়ার খেয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয়া যেতো। ওদের স্বামীরা পাশে বসে বিয়ার খেয়ে প্রায় ঘুমিয়ে থাকে।

সে মুখ ঝামটা দিয়ে বলেছে, করো না কেন, কে মানা করেছে?

প্রতিদিন যে মেয়েটি মুরগির মাংস কেটে দিতো এবং যে মেয়েটি রুই, মাগুর কেটে ব্যাগে সযত্নে তুলে দিতো তাদের প্রতি সত্যিই কেমন যেন একটা মমতা বোধ করতাম। মাছের কেজি পনেরো বিশ টাকা এবং মুরগির চল্লিশ পয়তাল্লিশ টাকা ভাবা যায়?

এরপরে এক বুড়ি আমওয়ালির ভালোবাসা। প্রৌঢ়া কিন্তু যৌবনা। তাতেও মুখে সৌন্দর্যের ছাপ। আমাদের দেখলেই কেমন আপন আত্মীয়ের মতো আহবান জানাতো। আমের কিলো দুই থেকে তিন টাকার মধ্যেই পাওয়া যেতো অনেক সময়। অবিশ্বাস্য, অবশ্যই নানান স্বাদের মিষ্টি আম। থাইল্যান্ডের তেতুলও মিষ্টি। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে মিষ্টির ভ্যারাইটি বের করছে ওরা।

ফলের আড়তে গিয়ে একবার দুই কন্যার মনে হলো, আঙুল কিনবে। আমরা তিন চার কেজি আঙুল দিতে বললাম।

মধ্য বয়সী থাই সুন্দরী মিষ্টি ভাষায় বললো, তিন চার কেজি বিক্রি হয় না। নিলে মোট নিতে হবে অর্থাৎ পুরো ঝুপড়ি দুই তিন মন এক সঙ্গে নিতে হবে। মন ভার করে ফিরে যাচ্ছিলাম।

পেছন থেকে থাই সুন্দরী ডাক দিল। একটি পলিথিন ব্যাগে দুই তিন কেজি আঙুর তুলে দিল মেয়েদের সঙ্গে। টাকা দিতে গেলাম নিল না। বললো, এটুকুর জন্য টাকা দিতে হবে না।

দুই কন্যাকে নিয়ে প্রায়ই তারা এখানে-সেখানে আদর-তামাশায় মাতিয়ে তোলে। যে কোনো শিশুদের আদর করা ওদের মনে হয় সহজাত এক প্রকৃতি।

থাইরা সুন্দরের পূজারি। এদের জাত শিল্পীও বলা হয়। মেয়েরা সব সময় স্নো, পাউডার, লিপস্টিক মেখে সেজেগুজে থাকে। এরা জাত শিল্পীই বটে। ফুল ও ফল সাজানো এবং পরিবেশনে এদের শৈল্পিক ছবির কাছে অনেকেই হার মানবে। চিয়াং মাই ও পাথাইয়া সুন্দরীরা হৃদয় পড়তে খুবই পটু।

ফলমূল-তরিতরকারির বাজার খুব শস্তা, ভালোই কেটে যাচ্ছিল। সমস্যা হলো, পরিবার-পরিজনসহ ছাত্রদের ফ্যামিলি একমোডেশন নিয়ে।

অনেক কষ্টে তাও একটা জুটে গেল কয়েক মাস পরে। এআইটি ছাত্রদের প্রথম টার্মে সপরিবারে অবস্থানের অনুমতি দেয় না। কারণ এতে পানি, বিদ্যুৎ ইত্যাদি খরচ বেশি পড়ে। আমার শিক্ষা গুরু আমিন এবং তার স্ত্রী যুক্তি দেখালেন, সে খরচটা তোমরা নিয়ে নিলেই পারো।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যদি ছাত্রদের সঙ্গে পরিবার রাখার অনুমতি দেয়া হয়, তা তোমরা যদি না দাও তাহলে কি এটা মানব অধিকার লংঘনের পর্যায়ে পড়ে না? কেউ ভালো থাকতে চাইলে তোমাদের জন্য তা তো পারবে না।

কর্তৃপক্ষকে তাদের আবাসিক অবস্থার কথা স্বীকার করতেই হলো। এরা যদি আবাসন ব্যবস্থা করতে না পারে তাহলে ছাত্রদের আবাসিক ফি ফেরত দিলে তারা ক্যাম্পাসের বাইরে কম খরচে থাকতে পারে।

এরপর আসে ক্লাস লাইব্রেরি ও পরীক্ষাদি। পৃথিবীর প্রায় চল্লিশটি দেশের সতীর্থদের প্রতিযোগিতার সঙ্গে পড়ার সুযোগ এখানে হয়। রাত জেগে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি, লাইব্রেরিতে ঘুমানো এখন স্মৃতিই বটে। তবে ভাবতে অবাক লাগে, একজন থাই কিংবা ফিলিপিনো অবিবাহিতা তরুণীর সঙ্গে লাইব্রেরিতে তালাবদ্ধ ছোট নির্জন রুমে সারা রাত নির্বিঘ্নে কাটিয়ে দেয়া যৌবনের জন্য বিশাল চ্যালেঞ্জই বটে। তা সম্ভব ছিল সম্পর্কের মধ্যে স্বচ্ছতা ছিল বলেই। বিশ্বস্ততা আর ভালোবাসা এমন একটি প্রতিরোধ ব্যবস্থা যা যখন-তখন জীবনে ভুল ডেকে আনতে পারে না।

চট্টগ্রাম থেকে

বিদেশ বাড়ি

-মাহবুব রেজা

চারদিকে যতোটুকু চোখ যায় শুধু গম ক্ষেত, মাঝে মধ্যে বন-জঙ্গল। তার মধ্যে চটের মতো রাস্তা চলে গেছে। ছবির মতো ঘরবাড়ি। তার চেয়েও যেন জীবন্ত ছবি মানুষের। পূর্ব জার্মানির মানুষজন বোধহয় একই রকম। খুবই নিরিবিলি আর সামাজিকতার ভেতর জড়াজড়িতে বসবাস। পুরনো ধ্যান-ধারণা এখানে প্রবল।

আমাদের হাইম যে জায়গায় তার নাম হলো কোলম। বলতে গেলে গ্রাম এলাকা। নিসকি হলো এর শহর। পাশের শহরের নাম হলো ড্রেসডেন। ড্রেসডেনের ওপাশে হলো সাবেক চেকোস্লোভাকিয়া এখন যা চেক প্রজাতন্ত্র। চেক হয়ে যখন জার্মানির ফ্র্যাংকফুর্টে এসে পৌছালাম তখন বেশ নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম। কোথায় যাই, কার কাছে যাবো। ফোন নাম্বার ছিল একটা। করলাম ফোন।

যিনি ধরলেন তিনি খুব গম্ভীর কণ্ঠে আমাদের ট্যাকসির চালককে বললেন তার কাছে যাবার জন্য। ফ্র্যাংকফুর্টের সবার কাছে তিনি সমানভাবে জনপ্রিয়। খুবই কাট কাট কথা বলেন। তাতে কারো কি এলো গেল তার ধার ধারেন না। কাউকে খুশি করে কথা তিনি বলতে চান না। আড্ডাবাজ আর বন্ধু-বৎসল বলে তার বিশেষ পরিচিতি পাওয়া গেল। নিজেও টের পেলাম। চব্বিশ বছর ধরে তার নিজস্ব

অস্তিত্ব বেশ প্রবলভাবে টিকিয়ে রেখেছেন। তার নাম শামসুল করিম। সবার কাছে পলভাই বলে পরিচিত।

তিনি প্রথমেই বললেন, জার্মানিতে থেকে কোনো লাভ হবে না। কেস টিকবে না, অযথা টাইম লস করে লাভ কি? তারচেয়ে নিজস্ব মানুষজন যেহেতু আছে ভাই, চলে যান লিওনার্দো দি ভিঞ্চির দেশে। তাতে কাগজপত্র হওয়ার সম্ভাবনা আছে। জার্মানিতে থেকে কোনো লাভ নেই। বাকিটা আপনার ব্যাপার।

তারপরও সেই নিষ্ফল কেস। স্টেটমেন্ট। ট্রান্সফার করা হলো পূর্ব জার্মানির এক গ্রামে। যেখানে গাছের মতো মানুষেরাও নির্বাক। প্রথম দিনে পরিচয় হলো আরো কয়েকজন বাঙালির সঙ্গে। নাটোরের সাব্বির, নরসিংদীর ওবায়েদ, নারায়ণগঞ্জের টিটু, সিলেটের কাশেম, সায়েদ। বড় একটা ঘরে আমাদের থাকতে দেয়া হলো। দোতলা, এক তলা, তিনতলার বিছানা। সপ্তাহে একদিন রেশনিংয়ে খাবার–দাবার। রান্না–বান্নার জন্য বড় কিচেন। হাইমের ভেতর অন্য এক জীবন। হাইমের একেকটি মুহূর্তকে আমার মনে হতো একেক জীবনের হাহাকার। ভাঙা টেলিফোনে লাইন দিয়ে দাড়িয়ে থাকতে হয়। নিজের পরিচিত মানুষজনকে ফোন করতাম ইচ্ছার বিরুদ্ধে। ছেলেমেয়ের কথা যখনই মনে হতো তখন ভাবতাম এ কিসের জীবন আমার? এক জীবনে মানুষ এতো কষ্ট ভোগ করে কেন? তারচেয়ে ধরণী দ্বিধা হলে ভালো হতো। তবু এরই ভেতর স্বপ্ন দেখার সাধ জাগে। নিজের ভেতর স্বপ্নেরা গান শোনায়। আলু বেচো, ছোলা বেচো, বেচো বাকরখানি, বেচো না বেচো না বন্ধু তোমার চোখের মণি।

হাইম থেকে তিন মাসের কাগজ দেয়া হলো। প্রথম দিনের মধ্যেই সবাই আমাকে নিজেদের করে নিল। রাতভরে সাব্বির গান গায়। সিলেটের সায়েদের ঘুম আসে না দুশ্চিন্তায়। কারণ সে মাছের চাষ করেছে আটলান্টিকে। কিন্তু এবার তার লস হবে এই টেনশনে নির্ঘুম রাত কাটে তার। সাব্বির সবাইকে নিয়ে বিকেলে যেতো গম ক্ষেতে। গত দুই মাসে তার এটা নিত্যঅভ্যাসে দাড়িয়ে গেছে। নাটোরের আঞ্চলিক টানে তার কথাবার্তায় প্রাণে কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্য আসতো আমাদের। সাব্বির রসিকতা করে বলতো, *আর বইলবেন না ভাই, শ্রোয়েডার আইসে হাতে পায়ে ধইরলো। না বইলতে পারলাম না। গম ক্ষেতের দেখাশোনার দায়িত্ব নিলাম। এখন তো শালা সব শুইদ্ধ মলাম* (মরলাম)।

মলাম শব্দটা বেশ টেনে বলার ফলে আমরা গম ক্ষেতের ধারে হেসে গড়িয়ে পড়ি। বিকেল থেকে সন্ধ্যা, রাত পর্যন্ত আমরা নির্বোধের মতো গম ক্ষেতের কিনারে বসে দেশপ্রেমের কথা বলে বলে সময় গুজরান করি এবং মনে মনে একটা দিন অতিবাহিত হলো এ আনন্দে দিশেহারা হই। এভাবে একদিন হাইম থেকে ট্রেনে চলে এলাম কাউকে না বলে ফ্র্যাংকফুর্টে। পলভাইয়ের মাধ্যমে উঠেছিলাম সোয়ালবাগার স্টুটে। এখানে আলমগীরভাই, লিটনভাই, আনোয়ারভাই, ওয়াহিদভাইদের বাসায়। খসরুভাই, মীমভাই, চৌধুরীভাই, ঝন্টুভাই, রিপনভাই, কামরুলভাই আরো কতো মানুষ যে আমাকে মানসিকভাবে সহায়তা দিয়েছেন তাদের কথা বিশেষভাবে স্মরণে আসে। প্রবাসে সবাই সবার জন্য এক আত্মা এটা বুঝেছি হাড়ে হাড়ে। চোখের জলে চোখ ভেসে গেছে কতোবার, কতোদিন, কতো মুহূর্ত সে ঈশ্বরই জানে!

জার্মানিতে একটা কথা প্রায়ই শোনা যায়। সেটা হলো, এক কুকুরের জীবন না হলে কাগজ হয় না। এক যুগ হলে তবে যদি কোনো গতি হয় জার্মানিতে। শুনে সারা শরীরে ভয় বয়ে যেতো। এক জীবন পার করার জন্য ইচ্ছার বিরুদ্ধেও কাউকে কাউকে অপেক্ষার প্রহর গুণতে দেখেছি অনেককে। কি অসম্ভব, অস্বাভাবিক জীবনের স্রোতে মানুষ ভেসে যাচ্ছে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। জীবন কতো চিত্র বিচিত্র!

জার্মান থেকে ফ্রান্স, ওখান থেকে এই পর্যন্ত আসার আগ মুহূর্ত সময় ধরে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আশপাশের মানুষকে পর্যবেক্ষণ করার নিরলস চেষ্টা করেছি। এটা আমার চিরাচরিত বদঅভ্যাস! পলভাইয়ের একটা কথা আমার ভেতর খুব প্রতিক্রিয়া করেছে। ওনার অভিজ্ঞতা থেকেই হয়তো এই কথা বলেন। প্রায়ই বিদেশের বাড়িতে নিজেকেই নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বী করে তুলতে হয়। অন্যের মধ্যে নিজেকে খুজতে যাওয়া বোকামি। এখানে সবাই যার যার ধান্ধায় অন্যকে ল্যাং মেরে ফেলে দিতে চায়। শুধু নিজের এবং নিজের করে জীবনটা তেজপাতা করে ফেলে সবাই। আমি এসবের মধ্যে নেই। নিজের মতো করে নিজেকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারাই হলো বড় কথা। নিজে ভালো তো সব ভালো। কাউকে পরোয়া করি না।

এখনো পূর্ব জার্মানের বিস্তৃত গম ক্ষেত আর আটলান্টিকের অজস্র মাছ ধরার স্বপ্ন দেখতে দেখতে আমার ঘুম ভেঙে যায়। ঘুম ভেঙে দেখি আমার চারপাশে কেউ নেই, দৌড়ে যাচ্ছি ঊর্ধ্বশ্বাসে। আমার পেছনে কাটা ঝোপ–ঝাড়, জঙ্গল। আমার কপাল এবং গাল থেকে রক্ত পড়ছে। আমি শুধু দৌড়েই যাচ্ছি। জানি না কবে এই দৌড়ের শেষ হবে? কাটা ঝোপ–ঝাড়ে এখনো আমার রক্তের দাগ লেগে আছে স্বপ্নের মধ্যে এখনো দিব্যি দেখতে পাই। তবু কাউকে পরোয়া করি না।

বিদেশ বাড়িতে কাউকে পরোয়া করতে নেই। এখানে নিজেই নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী।

মিলানো, ইটালি থেকে
athai992002@yahoo.com

ধর্ষিত

সেই এক যুগ হলো সউদি আরব এসেছি। এর মধ্যে যেমন মধুর স্মৃতি আছে তেমনি আছে ভয়ংকর অভিজ্ঞতার। তারই কিছু অংশ পাঠকদের জন্য তুলে ধরছি। তবে সেটা কোনো মধুর ঘটনা নয়, আমার জীবনের এক কালো অধ্যায়ের।

আমার কাজ ছিল দোকানের। সকাল আটটা থেকে যোহরের আযান পর্যন্ত। আবার আছরের পর থেকে রাত দশটা পর্যন্ত। কঠিন পরিশ্রমে ভালো পারিশ্রমিক না পাওয়াতে খুব ইচ্ছা ছিল ঘণ্টা খানেকের জন্য একটা পার্টটাইম কাজ করার। কিন্তু এই দেশের কঠিন আইনের জন্য তাও সম্ভব হচ্ছিল না।

ইতিমধ্যেই অনেক কাস্টমারের সঙ্গে আমার বেশ খাতির হয়ে গেল। তেমনই একজন হলো আবদুল্লাহ বিন আনসারী। তেমন উচ্চতা নেই, বয়স আনুমানিক পয়ত্রিশ চল্লিশ হবে। সে প্রতিদিন রাতে আমার ডিউটি শেষ হওয়া পর্যন্ত বসে থাকতো। আমিও তার সঙ্গে দশ পনেরো মিনিট গল্প করতাম।

এভাবে কয়েক মাস যাওয়ার পর সে একদিন আমাকে তার বাসায় নিমন্ত্রণ করলো। আমিও সায় জানালাম। ওই দিন রাতে তার বাসায় নিমন্ত্রণ খেয়ে গল্প করতে করতে রাত প্রায় দেড়টা দুটো হয়ে যায়। আমি বাসায় আসবো এমন সময় সে আমাকে খারাপ প্রস্তাব দিল। আমি তখনই তার কথার প্রতিবাদ জানিয়ে তাকে অনেক বোঝালাম, আল্লাহর ভয় দেখালাম।

তবুও সে নাছোড়বান্দা। যখন দেখলো কিছুতেই রাজি হচ্ছি না তখন সে পুলিশের ভয় দেখালো। বললো, আমি যদি রাজি না হই তাহলে আমাকে চুরির অপরাধে সে পুলিশে দেবে। পুলিশে দিলে নির্ঘাত সাত বছরের জেল।

কোনো উপায় না দেখে তার কথায় রাজি হলাম। প্রায় দুই ঘণ্টা জানোয়ারটা আমাকে নিয়ে ইচ্ছামতো খেললো। তখনকার সেই ভয়াবহ ব্যথার কথা এখনো মনে হলে শরীরে কাটা দিয়ে ওঠে। এ ব্যথা কোনোদিনও ভুলবো না। একজন পুরুষ হয়েও একজন পুরুষ দ্বারা ধর্ষিত হলাম, তাও প্রবাসে। এ কথা এতোদিন কাউকে বলতে পারিনি। যাযাদির কল্যাণে আজ ভারমুক্ত হলাম।

প্রবাসী ভাইদেরকে অনুরোধ করছি, আমার মতো কাউকে বিশ্বাস করে ধর্ষিত হবেন না।

নাম, ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

স্ববাস

–এম জেড ইসলাম মিঠু

দেশে কোনো কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না হওয়াতে ইওরোপে পাড়ি দিলাম ১৯৯৬ সালে। একদিকে আনন্দ স্বপ্নের ইওরোপে যাচ্ছি, অন্যদিকে মা–বাবা, আত্মীয়–স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার বেদনা। তবুও জীবনের চাওয়া–পাওয়া ও সংসারের হাল ধরতে হবে এই প্রত্যয় নিয়ে উড়ে চলে এলাম ডেনমার্কে।

পরিচিত বলতে কেউই ছিল না। প্রথম রাত হোটেলে কাটানোর পর পরিচিত হই মানুভাইয়ের সঙ্গে। তার সহযোগিতায় সজলভাইয়ের বাসায় দ্বিতীয় রাত কাটাই। অতঃপর তৃতীয় রাত কাটাতে হয় মামুনভাইয়ের বাসায়। এখানেই আপাতত বসবাসের স্থান হয় কয়েকদিনের জন্য।

মামুনভাইয়ের সহযোগিতায় রাজনৈতিক আশ্রয়ের সব আয়োজন শেষ করে সপ্তাহ খানেক পর চলে গেলাম রাজনৈতিক আশ্রয় কেন্দ্রে। কোনো কমতি ছিল না থাকা–খাওয়া ও পকেট খরচের ব্যবস্থার। মাসে দুইবার হাত খরচ হিসেবে পেতাম অল্প কিছু টাকা যা দিয়ে যাতায়াতসহ অন্যান্য প্রয়োজন মিটতো। রাজনৈতিক আশ্রয়ের ক্ষেত্রে দোভাষী হিসেবে ছিলেন বাচ্চুভাই। তার অসহযোগিতার কারণে সাত মাসের মাথায় রাজনৈতিক আশ্রয়ের বিষয়টি নাকচ হয়ে যায়।

অসহযোগিতার কারণ আঞ্চলিকতা। তিনি একজন রাজাকার এ পরিচিতিই মেলে তার সঙ্গে কথা বলে। এই সময়ের মাঝে কোনো কাজের জোগাড় হয়নি। হারাতে হলো থাকা–খাওয়ার সেই স্থানটি। হয়ে গেলাম একজন অবৈধ বসবাসকারী। উল্লেখ্য, রাজনৈতিক আশ্রয় চাইলে সাময়িক বসবাসের একটা পরিচয়পত্র দেয়া হয়। অবৈধ হিসেবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন মামুনভাই। আশ্রয়

পেলাম তার বাসায়। অবৈধ থাকাকালীন অবস্থাটা খুবই করুণ হাল হয়ে থাকে। স্থায়ী বসবাসকারী ঠিকমতো কথা বলে না, একটা তুচ্ছাতিতুচ্ছ ভাব করে থাকে। অবশ্য সবাই নয়, কেউ কেউ ছাড়া।

কিছুদিন পরে সেলিম চাকমার দোকানে কাজ করার প্রস্তাব আসে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত খুবই কম মজুরিতে। কি করার! কাজ নেই, জীবিকা নির্বাহের জন্যও তো কিছু একটা করা দরকার এই ভেবে লেগে গেলাম তার ওখানে। তিনিও আমার এই অবস্থার সুযোগ নিলেন। এভাবে কাজ করলাম বছর দেড়। এই দেড় বছর পর যখন মজুরি বাড়াতে বললাম তখনই বিভিন্ন অপবাদ দিয়ে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিলেন। কাজ থেকে তাড়ানোর সহজ এ একটাই পন্থা।

অনেকেই এমন করে থাকে এবং এর আগেও অনেকের বেলায় এমন ঘটেছে। তারই পুনরাবৃত্তি হলো আমার বেলায়। কাজ ছেড়ে দিলাম। হাতবদল হলো দোকানের। আবার ডাক পড়লো সেখানে কাজের। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই পুলিশ হাজির অবৈধ কাজ যারা করে তাদের ধরার জন্য। সন্দেহ না করার মতো অবকাশ রইলো না। কেউ হয়তো পুলিশকে জানিয়ে দিয়েছে। পেছনের দরজা দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে এ যাত্রা রক্ষা হলো। কাজ ছেড়ে দিলাম ওখানের।

এরই মধ্যে আবার কাজ শুরু করলাম নিজামের দোকানে। একদিন কাজ শেষে নিজামের গাড়িতে করে ফিরছি আমরা পাচজন। তাইয়ুরভাই, নিজাম, আমিসহ আরো দুজন। দুজনের মাঝে পেছনে বসা আমি। এদের মাঝে একমাত্র আমিই অবৈধ। হঠাৎ পেছন থেকে টহল পুলিশের গাড়ি ইশারা করলো আমাদের গাড়ি থামাতে। নিজাম গাড়ি থামালো। দুইপাশে দুজনকে ছাড়িয়ে পালানোর উপায় নেই। একমাত্র আল্লাহই ভরসা। কোনো উপায় না পেয়ে আল্লাহকেই স্মরণ করতে লাগলাম। একে একে সবার পরিচয়পত্র দেখতে লাগলো। আমাকে জিজ্ঞাসা করাতে মিথ্যা করে বললাম, আশ্রয় কেন্দ্রে রেখে এসেছি।

পরে বললো, যে কোনো ফটো আইডি দেখাও।

পকেট থেকে বোকার মতো মাসিক বাস কার্ডটা বের করে দিলাম। পরক্ষণেই ভাবলাম কমপিউটারে যদি কার্ডের সিরিয়াল নাম্বার খুজে দেখে তবে তো পেয়ে যাবে দীর্ঘ দেড় বছর আমি এখানে অবৈধভাবে বসবাস করছি। বাস কার্ড এবং জন্ম তারিখ জেনে চলে গেল তাদের গাড়িতে। কিছুক্ষণ পরে এসে বাস কার্ডটি দিয়ে দিল এবং আবার জন্ম তারিখ জিজ্ঞাসা করলো। ঠিক ঠিক বলাতে ছেড়ে দিল।

উল্লেখ্য যে, এখানে জন্ম তারিখ দিয়ে কমপিউটারে সব কিছু জানা যায় একজন ব্যক্তির পরিচয় ও অন্যান্য বিষয়। সেদিন হয়তো স্বয়ং আল্লাহ এসে পুলিশের কানে কানে বলে দিয়েছিল আমাকে ছেড়ে দেয়ার জন্য। না হলে কমপিউটারে আমার বৃত্তান্ত সব ঠিক ঠিক করে দেখিয়েছিল। এ যাত্রা পার পেয়ে সিদ্ধান্ত নিলাম চুক্তি বিয়ে করবো।

আবার গেলাম আশ্রয় কেন্দ্রে নতুন করে আশ্রয় প্রার্থনা করতে হলো। কাগজে বিয়ে হলো এক ড্যানিশ মেয়ের সঙ্গে। কাগজের বৌ–এর জ্বালাতনের কথা লিখে শেষ করা যাবে না। অনেক কষ্টে তিন বছর নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে কাগজের বৌয়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে স্থায়ী বসবাসের অনুমতি পেলাম। দীর্ঘ ছয় বছর পর দেশে ফিরলাম নির্বাসন থেকে। হারালাম নিকট আত্মীয় খালা, ফুপা ও আরো অনেককে যাদের দেখা মিলবে না কোনোদিন। তবুও শান্তি, সন্ত্রাসী হিসেবে নিজের নাম নেই পুলিশের খাতায়।

দেশে থাকলে হয়তো থাকতো। কারণ সন্ত্রাসী তৈরির উৎস পুলিশ। ভালো না থেকেও ভালো আছি এই ভেবে প্রবাসে।

প্রবাসই এখন স্ববাস।

ডেনমার্ক থেকে

দেশের জন্য

–হাফিজ রশীদ

আমি যখন ক্লাস টুতে পড়ি তখন এক বন্ধু বললো, তুই বিদেশ যেতে পারবি, তোর বাম পায়ে তিল আছে।

সেই থেকে স্বপ্নের শুরু। বিদেশ ভ্রমণ আমার আরাধ্য হয়ে যায়। ট্রাভেল কাহিনীগুলো গোগ্রাসে গিলতে শুরু করলাম। মায়েরা যেমন জরায়ুতে বিভাজন পদ্ধতিতে একটু একটু করে সন্তান বড় করে তেমনি বিদেশ ভ্রমণ নামের স্বপ্নটা আমি বড় করছিলাম। ১৯৯৭ সালে আমরা কয়েকজন মিলে চলে গেলাম পাশের দেশ ইনডিয়ায়।

আমরা বেনাপোল দিয়ে ঢুকলাম সকাল দশটায়। যাবার সঙ্গে সঙ্গে ঘড়ির সময় পাল্টে নিয়ে সাড়ে নয়টা করলাম। তখন ভাবলাম, আমার দেশ আধা ঘণ্টা এগিয়ে আছে। ট্রেনে পরিচয় ঘটলো এক ইনডিয়ানের সঙ্গে। আমাকে প্রথম প্রশ্ন, হাসিনা কেমন দেশ চালাচ্ছে?

বিব্রতবোধ করেছিলাম। কারণ তার সাত দিন আগে হাসিনার *সোনার বাংলার* সৈনিকরা আমার পকেটের সাতশ টাকা হাইজ্যাক করেছিল।

ইনডিয়ানের পরের প্রশ্ন আরো বিব্রতকর। বাংলাদেশ কি ইনডিয়ার সঙ্গে একত্র হয়ে যাবে?

আমার শরীর রি রি করেছিল। একটা স্বাধীন দেশকে নিয়ে এমন কথা কি কেউ বলতে পারে? আমার ধারণা, দেশের প্রতি আমার ভালোবাসা বাড়াবাড়ি ধরনের। দেশ ভ্রমণের শুরু থেকেই আমার খারাপলাগা শুরু হলো। কলকাতা গিয়ে গুরুতর অভিজ্ঞতা হলো, চিট ট্যাকসি ক্যাবের ড্রাইভারের সঙ্গে।

দেশ থেকে দূরে গেলে হয়তো দেশের প্রতি ভালোবাসা বাড়তে থাকে। আমার হৃদয় চূর্ণ হয়ে গেল যখন দেখলাম ফারাক্কা বাধ। ফারাক্কা বাধের একদিকে ধূ ধূ বাংলাদেশের বালুচর, আরেকদিকে ইনডিয়ার অংশ। বার বার মনে হচ্ছিল, এই বাধ উদ্বোধনের সময় ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বঙ্গবন্ধু উপস্থিত ছিলেন।

ইনডিয়ার বাংলা পত্রিকা কিংবা ইংরেজি পত্রিকা খুজে কোথাও বাংলাদেশের খবর পাওয়া যায় না। কয়েকদিন আগে জাকারিয়া স্বপনের *ভুল সমীকরণ* পড়ে আমার সেই দেশ ভ্রমণের কাহিনীই বার বার মনে হচ্ছিল।

ইনডিয়া কতোভাবে আমাদের দেশকে শোষণ করছে। তবুও অর্ণব রায়রা বলে, *আমি গর্বিত ইনডিয়ান।* ধিক অর্ণব রায়, কিভাবে তোমার দেশের একজন লোক, একজন ইউনিভার্সিটি গ্র্যাজুয়েটকে বলতে পারে, বাংলাদেশ কি ইনডিয়ার সঙ্গে একত্র হয়ে যাবে?

কাশিগঞ্জ, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ থেকে

জাল ভিসা

–মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম

১৯৯৩ সাল। ওই সময়ই আমাদের গ্রাম থেকে বিদেশে লোক যাওয়া শুরু করে। এক সময় আমার এক কাকা আমাদেরকে বললেন তিনিও বিদেশে যাবেন। আমাদের কেউ রাজি হলো না।

তখন তিনি লুকিয়ে এক দালালের সঙ্গে পরামর্শ করলে ওই দালাল বললো, তুমি আমাকে মাত্র সত্তর হাজার টাকা দেবে, তোমাকে মালয়শিয়া পাঠিয়ে দেবো। কিন্তু একটা শর্ত আছে, শর্ত হলো তোমাকে যে বিদেশে পাঠাচ্ছি তা অন্য কেউ জানতে পারবে না।

তার কথাতে আমার কাকা রাজি হন। তার কিছু জমি ছিল তিনি লুকিয়ে সেই জমি বিক্রি করেন। দালালকে সত্তর হাজার টাকা দিলেন। প্রায় তিন চার মাস পর দালাল কাকাকে খবর দিল যে তোমার ভিসা এসেছে। তুমি আসো। তখন তিনি দালালের খবর শুনে যান তার কাছে।

দালাল তাকে তার কাজ সম্পর্কে খুব ভালোভাবেই বুঝিয়ে দেন। এবং বলে দেন, ৭ মার্চ ১৯৯৩–এ তোমার ফ্লাইট। তুমি এই অল্প কয়েক দিনের মধ্যে কাপড়–চোপড় যা আছে তা নিয়ে তৈরি হও।

৬ তারিখ যখন এলো সেই দিন কাকা আমাদের সবাইকে বললেন, তার আগামীকাল রাত সাড়ে নয়টা মালয়শিয়া যাওয়ার ফ্লাইট।

তখন আর আমাদের কিছু করার নেই। পরদিন আমরা সবাই মিলে এগিয়ে দিলাম কাকাকে, তিনি চলে গেলেন মালয়শিয়ায়। একদিন দুই দিন করে এভাবে ছয় মাস হয়ে গেল, কোনো খবর পেলাম না। তিনি কি মারা গেছেন নাকি বেচে আছেন।

হঠাৎ একদিন বাড়িতে একটি চিঠি এলো। ঢাকা মেডিকাল কলেজ হাসপাতাল থেকে আবু তাহের, গ্রাম ও ডাকঘর বাখরনগর, থানা মুরাদনগর, জেলা কুমিল্লা নামে একটি রোগী আমাদের কাছে রয়েছে। ওর গার্ডিয়ান যদি কেউ থাকেন তাহলে এসে নিয়ে যান।

তখন আমরা ওই চিঠি পড়ার পর সঙ্গে সঙ্গে একটি গাড়ি নিয়ে চলে আসি ঢাকা মেডিকাল কলেজে হাসপালে। গিয়ে দেখি আমাদের তাহের কাকা। তখন তার অবস্থা ছিল খুব খারাপ। তার দাড়ি, গোফ এবং চুল খুবই বড় বড় ছিল। তাকে দেখতে একটা জঙ্গলের পশুর মতো দেখাচ্ছিল। তখনো তিনি কথা বলতে পারতেন না।

এক মাসের মতো চিকিৎসা করানোর পর তিনি ভালো হয়ে উঠলেন। এবং বাড়ি নিয়ে এলাম । বাড়িতে আনার পর আমরা জানতে চাইলাম? তোমার এই অবস্থা হলো কিভাবে, তুমি এতোদিন কোথায় ছিলে, কি করছো? ছয় মাস ধরে তোমার কোনো খোজখবর পর্যন্ত পাইনি।

তখন কাকা বললেন, সবই বলবো।

তাকে বললাম, আগে বলো এতোদিন কোথায় ছিলে, এই রকম হলো কিভাবে?

বলছি, আমি একটি দালাল ধরে মালয়শিয়ায় যাই। আমাদেরকে মালয়শিয়ার বর্ডারের অনেক আগেই নামিয়ে দেয়। ওখান থেকে একটি জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে যায় আর বলে যায় রাত দশটার দিকে লোক এসে নিয়ে যাবে। আমরা লোকের আসায় বসে থাকি।

রাত দশটার দিকে লোক এসে আমাদেরকে ডাক দিতে শুরু করে আমরা তখন ওই লোকের ডাকে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসি। এসেই দেখি পুলিশ। আমাদের মধ্য থেকে তিন চারজনকে তারা ধরে ফেলে। তিন চারজনের মধ্যে আমিও ছিলাম। আমাদেরকে জেলখানায় নিয়ে যায়। ওই জেলখানায় এতো কষ্ট দিয়েছে যা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। আমাদেরকে সকালে দিতো একটি রুটি আর এক গ্লাস পানি। দুপুরে দিতো এক গ্লাস পানি। এবং রাতে দিতো এক প্লেট ভাত ও একটি শুটকি মাছ রান্না করা। এই সব খেতে হতো পেটের ক্ষিধেয়। ওই সমস্ত খাবারই খেতে হতো। যদি পেটের ক্ষিধেয় কেউ চিৎকার করতো তাহলে তাকে শাস্তি দিতো।

জেলখানার এই মাথা থেকে ওই মাথা পর্যন্ত দৌড়াতে হতো। খুব শীত ছিল, গায়ে দেয়ার মতো ভারী কোনো কাথা বা কম্বল দিতো না। একটি পাতলা কম্বল শুধু দিতো। মাথার নিচে কিছুই দিতো না। এবং প্রত্যেক সাপ্তাহে প্রথম দিন সবাইকে দশটি করে বেত্রাঘাত করতো, মুখের ভেতর কাঠের টুকরো দিয়ে দিতো যেন কেউ চিৎকার করতে না পারে। সপ্তাহে একদিন গোসল করতে হতো। যদি প্রস্রাব করবো বলতাম, তাহলে প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে বাশের তৈরি চিকন অংশ ঢুকিয়ে দিতো যেন আর প্রস্রাব করতে না পারে। এই জেলখানার মতো এতো বড় কষ্ট আমার মনে হয় না অন্য কোনো দেশে আছে।

এতোক্ষণ শোনার পর প্রশ্ন করলাম, ওইখানে থেকে ছাড়া পেলে কিভাবে?

মালয়শিয়ার সরকারের কাছে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া অনুরোধ করেছিলেন বাঙালি যতোজন আছে তাদেরকে ছেড়ে দিতে। তারপর আমাদের ছেড়ে দিয়ে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়।

মুরাদনগর, কুমিল্লা থেকে

একটি স্বপ্ন

–কাজী সালমা

আমার এই স্বপ্নের শুরু আজ থেকে প্রায় দশ মাস আগে। ২০০২ সালের জুন মাসে আমার জীবনে প্রথম দেশ ছেড়ে বিদেশের মাটিতে পা রাখা। ২০০২ সালের জুন মাসের ১০ তারিখ যখন আমার প্রাণপ্রিয় মা, বড় বোন, বন্ধুর মতো ছোট ভাই এবং পরিচিত সবাই আমাকে গেটের সামনে বিদায়বেলা কান্না ভরা চোখে দেখছিল এবং উপদেশ দিচ্ছিলেন তখন আমার সামনে এক স্বপ্নের হাতছানি ইওরোপ ভ্রমণের লোভনীয় যাত্রার শুরু।

আপনজন ছেড়ে আসার কষ্ট সেদিন প্রথমবারের মতো উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম। যখন এই লেখা লিখছি তখন আমার দেশ ছেড়ে অনেক দূরে পূর্ব ইওরোপের অপূর্ব সুন্দর এক স্থানে কসোভোতে।

প্রথম যখন কসোভোর বুকে পা রাখি তখনো আমার ঘোর কাটেনি। তারপর ইমিগ্রেশন রুম পার হয়ে বাইরে এসে দেখি আমাদের সকলের প্রিয় নিজামভাই দাড়িয়ে আছেন তার ইউএন লেখা জিপ নিয়ে। সেদিনই নিজামভাইকে প্রথম দেখি। যদিও ভাইয়া–ভাবীর কাছে নিজামভাইয়ের গল্প শুনতে শুনতে তিনি খুব কাছের মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন আমার মানসপটে।

তিনি প্রথমেই জানতে চাইলেন, ভ্রমণ কেমন হয়েছে?

পৃষ্টিনা এয়ারপোর্ট পর্যন্ত আমার ভ্রমণ ভালোই হয়েছিল। কিন্তু এয়ারপোর্টে পাচ মিনিট থাকার পর আমার মন খুবই খারাপ হয়ে গেল। এই মন খারাপ হওয়ার পেছনে একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয় ছিল। আমরা ঢাকা থেকে প্রথমে দুবাই এবং দুবাই থেকে ইস্তাম্বুল এয়ারপোর্টে পৌছাই। ইস্তাম্বুলে আমাদের প্রায় নয় ঘণ্টার ট্রানজিট ছিল। এ সময়ে আমি, আমার ভাইয়া কাজি জহিরুল ইসলাম, ভাবী মুক্তি শরিফ এবং আমার ভাতিজা অগ্নি ট্রানজিট লাউঞ্জের ডিউটি ফৃ শপগুলোতে হাটাহাটি করছিলাম। ঘুরতে ঘুরতে এক সময় অগ্নি আবিষ্কার করলো, আরো তিনজন বাঙালি এয়ারপোর্টে ইতস্তত ঘোরাফেরা করছে। ওরাই ছিল আমার দেখা ঢাকা ছাড়ার পর প্রথম বাঙালি।

তাদেরকে দেখে কেন জানি মনের অজান্তেই বেশ আনন্দিত হয়ে উঠেছিলাম। হয়তো একেই বলে স্বদেশপ্রীতি। তারপর তাদের সঙ্গে ভাইয়া পরিচিত হয়ে যখন ভাবীকে তাদের প্রসঙ্গে বলছিলেন তখন আমি পাশে বসে সব কিছু শুনে বুঝতে পারলাম তাদের বিদেশে আসার রাস্তাটা স্বাভাবিক না। তারা অবশ্য বলেছে যে, কসোভোতে যাচ্ছে কোনো ব্যবসায়িক কাজে যা তাদের চেহারা এবং আচরণের সঙ্গে মোটেও মিলছে না।

তাদেরকে দেখার পর থেকে আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, আমাকেও যদি ইমিগ্রেশন অফিসার কসোভোতে ঢুকতে না দেয়! যদিও আমার পাসপোর্ট একেবারে খালি না। বৃটিশ ভিসা আছে আমার পাসপোর্টে। সবচেয়ে বড় সাপোর্ট আমার ভাইয়া এবং ভাবী দুজনই কসোভোর ইউএন মিশনে কর্মরত। সেই সুবাদে আমি এখানে ভিজিটর হিসেবে আসতেই পারি। আমার ভাতিজা অগ্নি আরো একবার কসোভোতে এসে ঘুরে গেছে।

অতএব কোনো রকম ঝক্কি–ঝামেলা ছাড়াই আমরা ইমিগ্রেশনের কঠিন দরজা পার হতে পারলাম। কিছুক্ষণ পর দূর থেকে দেখলাম সেই তিন বাঙালি যুবককে ইমিগ্রেশন পুলিশ বেশ জেরা করছে।

ঠিকানাবিহীন
wahab@un.org